উপন্যাস

শূন্যের উদ্যান

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com

সূচিপত্র

১. শালার মিছিল 2
২. পৃথিবীটা বড় ম্লান 84
৩. দালানকোঠা 103
৪. বিয়ের দিন 120
৫. নাইট শো 131

১. শালার মিছিল

গেরো! শালার মিছিল!

গৌরহরি ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, এ রাস্তায় গাড়ি যাবে না দাদা।

পিছনের সিটে মুখে উদ্বেগ নিয়ে বসে আছে চশমা-পরা মোটাসোটা গোলগাল যুবকটি। মুখে ঘেমো ভাব। চশমাখানা পিছলে নাকের ডগার দিকে নেমে এসেছে। খুবই বোকাটে আর অসহায়। দেখাচ্ছে তাকে। ফরসা মুখখানায় লালচে আভা। মানুষের যে কত রকমের বিপদ আছে! এ ছেলেটার কীরকম বিপদ কে জানে! গৌরহরি অতশত জানে না। জানার দরকারই বা কী! সব মানুষই চলেছে নিজের গলির গলিপথে। সে সব প্রাইভেট গলিপথ। সব মানুষের জীবনই প্রাইভেট গলিপথ, সেখানে গৌরহরির ট্যাক্সি ঢোকে না।

ছেলেটা বলল, তাহলে কী হবে! আমার যে খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার।

দেখছেন তো মিছিল! এর ল্যাজা মুড়ো কোথায় কে জানে! সামনেটা হয়তো কলেজ স্ট্রিট পেরোচ্ছে, পিছনটা বোধহয় শ্যামবাজারের পাঁচমাথা পেরোয়নি।

কিন্তু আমার ভীষণ তাড়াতাড়ি দরকার।

গৌরহরি বিড়বিড় করে আপনমনে হিন্দিতে বলে, তব ক্যা করু! উড়কে যাই!

ছেলেটা অসহায়ভাবে বলে, দেখুন যদি গাড়িটা ঘোরাতে পারেন। সারকুলার রোড দিয়ে আরও নর্থে গেলে বোধহয় মিছিলটা এড়ানো যাবে।

গ্রে স্ট্রিটে এখন গায়ে গায়ে গাড়ি জমে আছে। ভিড়ের মধ্যে বদ ছোকরারা যেমন মেয়েদের গায়ে গা ঘষে সেরকমই গা ঘষটাচ্ছে গাড়ি। একটা লম্বা প্লিমাউথ গৌরহরির ট্যাক্সির ডানদিকে এসে দাঁড়াল, দরজা খোলারও জায়গা রইল না।

এই প্রাইভেট!—গৌরহরি চেঁচাল, এটা কী হচ্ছে অ্যাঁ! এটা কী ধরনের ইন্টারফিয়ারেন্স!

ইংরিজি শব্দটা গৌরহরি উচ্চারণ করল ঠিক যেমন ঢাকার ইংলিশ স্কুল সেন্ট অ্যান্টনিজ-এর ফাদার ইভান্স উচ্চারণ করত। আজও যখন গৌরহরি মাঝেমধ্যে এক আধটা ইংরিজি বলে তখন সমঝদার মানুষ তাকে একটু চেয়ে দেখে। এ সব উচ্চারণ সেই ইংলিশ স্কুলে শেখা, পাক্কা সাহেবদের কাছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সেন্ট অ্যান্টনিজ-এর শেষ ক্লাস পর্যন্ত পৌঁছয়নি গৌরহরি। পর পর দু'বছর টাইফয়েড আর পোলিও তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল। টাইফয়েড় নিয়েছিল গৌরহরির মগজটাকে, পোলিও নিল বাঁ-হাত আর বাঁ-পা। এখনও উত্তেজিত হলে গৌরহরির মাথার মধ্যে কেমন ঝমঝম একটা শব্দ হয়। পাগল-পাগল লাগে। টাইফয়েডের পর সে যখনই বইপত্র নিয়ে পড়তে বসেছে, তখনই কিছুক্ষণ একটানা পড়ার পর মাথায় কোথাকার কোন সাজঘর থেকে দু'খানা নূপুর-পরা পা তার মাথার মঞ্চে চলে আসত নাচতে নাচতে। কীরকম রিমঝিম শব্দ হতে থাকত। তখন গৌরহরি প্রায়ই সেই শব্দে সম্মোহিত হয়ে বসে থাকত, চোখের সামনের সব দৃশ্য মুছে গিয়ে ফুটে উঠত এক শূন্যতার দৃশ্য। আর কেবল সেই শব্দ আর শব্দ। রিমঝিম রিমঝিম, দু'খানা নাচের পা ঘুরছে, উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম দিচ্ছে গুলিয়ে। সেই শব্দে তার সব বোধ ডুবে যেত। তার বাবা বগলাপতি ডাকসাইটে ব্যবসাদার, টিকাটুলিতে সাহেবের বাড়ির মতো বাড়ি করেছিলেন। সব ছেলেকে বিলেত ঘুরিয়ে আনবেন, এরকম সংকল্প ছিল তার। বড় দুই ছেলে সেন্ট অ্যান্টনিজ পার হল, কিন্তু গৌর পারল না। গিরি ডাক্তার, সাহেব ডাক্তার, কলকাতার স্পেশালিস্ট, কেউই সেই শব্দটাকে বন্ধ করতে পারল না। বগলাপতি আপনমনে অনেক গাল দিলেন ছেলেকে, ডাক্তারদের এবং নিজের ভাগ্যকে। অবশেষে স্কুল ছাড়িয়ে গৌরহরিকে অসাধ্যসাধন থেকে মুক্তি দিলেন। বাড়িতে মাস্টারের কাছে গৌর পড়ত একটু-আধটু। পড়ার কোনও চাপ দেওয়া হত না। পরের বছরই

পোলিও। আবার দীর্ঘকাল বিছানা নিতে হল তাকে। অনেক চিকিৎসার পর মেহের কালীবাড়ি থেকে এক তান্ত্রিক এসে বলল, সারিয়ে দিতে পারি, তবে খুঁত থেকে যাবে। থাক খুঁত, সারাও। কীসে সেরেছিল কে জানে। তবে সেরেছিল ঠিকই। কেবল বাঁ-হাত আর বাঁ-পা শুকিয়ে কাঠি হয়ে রইল। অবশ্য যে দুটো একেবারে অকেজো নয়। একটু কমজোরি, এই যা। নইলে গৌরহরি তাদের দিয়ে সব কাজই করিয়ে নেয়। মেয়েমানুষকে আদর করা পর্যন্ত।

গৌরহরির ইংরিজি কথাটা শুনে প্লিমাউথের জানালা দিয়ে কালো চশমাপরা একজোড়া চোখ তাকে একটু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল। প্লিমাউথের জন্যই জ্যাম হয়ে গেল রাস্তাটা। ঘোরানোর জায়গা নেই। একটু পিছু হটবার চেষ্টা করল সে, পি পি করে অমনি পিছন থেকে আর্তনাদ করল একটা ফিয়াট। গৌরহরি ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেটাকে বলল, দেখছেন তো গাড্ডা! ডানদিকের প্রাইভেটটাই ঝামেলা করেছে। এ জট ছাড়াতে এখন কত সময় লাগে কে জানে!

ছেলেটা চশমা-জোড়া ঠেলে তুলে চারদিকে চেয়ে দেখল টালমাটাল। বলল, নেমে যদি মিছিলটা ক্রস করে ওপাশ থেকে ট্যাক্সি ধরতে পারি তবে বোধহয়–

তাই করুন।

মিছিলটা কি খুব বড় মনে হচ্ছে?

গৌরহরি হাসে, ভুখা মানুষ, বেকার মানুষ সমস্ত দেশে ভর্তি। তা মিছিল তো একটু বড় হবেই। এগিয়ে গিয়ে দেখে আসুন না, ল্যাজ দেখা যাচ্ছে কি না।

ছেলেটা দরজা খুলে নেমে একটু এগিয়েই ফিরে এল, ও বাব্বাঃ, ওদিকটা লালে লাল। আরও মাইল খানেক আছে বোধহয়।

এই বলে ছেলেটা মিটার দেখে পয়সা দিয়ে দেয়। গৌর বলে, মিছিলটা ক্রস করতে পারবেন তো?

বলে কয়ে চলে যাব। আমার বড় জরুরি দরকার। ওরা দেবে না ক্রস করতে?

তাই দেয়? পেরোতে গেলে ঝাড় লাগাবে।

ছেলেটা অসহায়ভাবে বলে, তাহলে?

গৌর হাসে, লাইনে ঢুকে মিছিলে শামিল হয়ে যান। কয়েক পা হেঁটে দু'একটা স্লোগান ঝেড়ে লাইন পালটে ওপাশের লাইনে চলে যাবেন। আবার স্লোগান ঝাড়বেন কয়েকটা, তারপর টুক করে কেটে পড়বেন। মিছিল ক্রস করার ওই হচ্ছে কায়দা।

ছেলেটা চলে গেল। ওই রকম গোল চশমা-পরা মোটাসোটা বোকাটে ছেলে এ যুগে অচল। ভাবে গৌর, আর হাসে। বলতে কী, একসময়ে সবাই মনে করেছিল যে গৌরহরিও অচল। এ সংসারে দুটো শুখো হাত-পা আর মগজে নাচের শব্দ নিয়ে কিছুতেই বেশিদূর পর্যন্ত যাওয়া যায় না। বগলাপতি তাই ভাবতেন আর বিড়বিড় করে গাল দিতেন। মুখটা বড় খারাপ বগলাপতির। ছেলেদের শালা-শোরের বাচ্চা বলতে আটকায় না। তা গৌরহরি ছিল তার ছেলেদের মধ্যে। একেবারে অচল মুদ্রা। বড় দুই ছেলে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে পাস করল, তারপর গেল কলকাতা, তারপর গেল বিলেত। তৃতীয় গৌরহরি হয়ে রইল অর্ধেক তৈরি করা পুতুলের মতো। যেন বা কোনও কারিগর গড়তে গড়তে হঠাৎ হাত থামিয়ে উঠে গেছে, তাই গৌরহরির মূর্তিখানা আর শেষ হয়নি।

বগলাপতি দেশভাগের সময়ে বিস্তর বুক চাপড়ে ভিতরে ভিতরে মাল পাচার করলেন কলকাতায়। তখনও দুই ছেলে বিলেত থেকে ফেরেনি। কেবল অপদার্থ গৌরহরি তার সহায়-সম্বল। বগলাপতি একা-একাই অতবড় ব্যাবসা গোটালেন বিড়বিড় করতে করতে। বউ আর আধা-ফিনিশ ছেলেকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। একটা বাড়ি কিনলেন বালিগঞ্জে গোপনে। আর প্রকাশ্যে খানিকটা জায়গা দখল করলেন যাদবপুরে রিফিউজি কলোনিতে।

সে সময়ে খবর এল, তার বড় ছেলে মেম বিয়ে করেছে। সে আর ফিরবে না। বগলাপতি ভয়ংকর ভেঙে পড়লেন। গৌরহরি তখন যুবাপুরুষ, কিন্তু অপদার্থ। তবু হাতের মুঠোর মধ্যে থাকা ছেলে। বগলাপতি বরাবরই গৌরকে একটু বিশ্রী প্রশ্রয় দিতেন, সে অসুস্থ এবং নিরীহ বলে। বড় ছেলের খবর পেয়ে। তিনি আরও আঁকড়ে ধরলেন গৌরকে। কিন্তু গৌর তো অপদার্থ, হাফ-ফিনিশ। চলে-ফেরে, খায়-দায়, কথা বলে, কিন্তু তাকে দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, তার দ্বারা কিছু হবে। বগলাপতিরও হল না। তিনি বড় ছেলেকে চিঠি লিখলেন, বিধিমতো মেমকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আইস। তোমার আবার বিবাহ দিব। উত্তরে ছেলে লিখল, তা সম্ভব নয়। আমার আশা ত্যাগ করুন। তখন থেকেই গৌর জানে, সে বাপের সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। বগলাপতি তাকে গড়িয়াহাটায় একটা দোকান করে বসিয়ে দিলেন। গৌরহরি দোকান করতে লাগল। বিক্রিবাটা মন্দ ছিল না। কিন্তু ঝামেলা হত দিনের শেষে, যখন দোকান বন্ধ করে গৌর হিসেব করতে বসত। হিসেবের অঙ্ক তার কাছে বরাবরই ভয়াবহ। কাজেই টাকা-আনার হিসেব শুরু করলেই সে স্পষ্ট টের পেত তার মাথার মধ্যে সেই অনভিপ্রেত নর্তকী তার সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসছে ঝমঝম করে, এক্ষুনি নাচ শুরু হবে। বগলাপতি আবার চিন্তায় পড়লেন। গৌরকে ডেকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন, কী করবি গৌরা? কী করতে তোর ইচ্ছে করে? বসে বসে তো আর খেতে পারবি না, পাঁচভূতে লুটে খাবে। একটা কিছু কর।

গৌর খুব ভাবত। কিন্তু ভেবে কিছু পেত না। বস্তুত তার মাত্র দু'-একটা বিষয়ই প্রিয় ছিল। ময়দানে ফুটবল খেলা দেখা, সিনেমা আর ঘুম। এইসব, আর চিন্তাভাবনাহীন, উদ্বেগহীন হালকা দিন কাটানো। কোনও কাজের কথা ভাবলেই তার বুকের ভিতরটা দুরদুর করত, আমি ব্যাটা হাফ-ফিনিশ, ফিফটি পারসেন্ট মানুষ, আমি শালা কী করব?

কিন্তু তারপরও একটা কয়লার ডিপো তাকে দিয়ে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন বগলাপতি। সেটা ফেল মারল তো নিজের সঙ্গে নিয়ে ঘুরলেন এদিক ওদিক। বগলাপতির ব্যাবসা ছিল নানারকম জটিল কুটিল পথে, সেগুলো বোঝবার মতো চিন্তাশক্তি গৌরের ছিল না। বগলাপতি ক্রমেই হতাশ হতে হতে একদিন ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, যাঃ শুয়োরের

বাচ্চা, কিছুই যখন পারবি না, তখন যা, গিয়ে ড্রাইভারি শেখ। শিখে আমার গাড়ি চালাবি। প্রতি মাসে কেন পরের ছেলেকে দেড়শো টাকা করে ধরে দিই! অর্থাৎ সোজা কথা, বগলাপতি ছেলের বসে খাওয়া সইতে পারতেন না। কিছু না পারো তো বাপের সোফারি করা।

পুরনো একখানা ডজ গাড়ি ছিল তাদের। সেটা চালাত হরিপদ। রোগাটোগা ভালমানুষ ছেলেটা। হাফ-ফিনিশ গৌরহরি গাড়ি চালানো শিখবে জেনে সেও খানিকটা হাঁ করে রইল। বলল, গাড়ির যে

অনেক ব্যাপার রে! ক্লাচ, ব্রেক, অ্যাকসেলেটার, গিয়ার, স্টিয়ারিং, তুই সব সামলাতে পারবি?

গৌরহরি উদাস গলায় বলল, তা আমি কী করব? আমি কি চেয়েছি শিখতে? বগলু ছাড়ছে না যে!

আড়ালে-আবডালে গৌরহরি বাপকে আদর করে বগলু বলে উল্লেখ করত। ফলে কতবার বকুনি খেয়েছে।

তারপর বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি, অর্থাৎ বগলুর পোলা গৌরা পুরনো আমলের ডজ গাড়িতে ভালমানুষ হরিপদর পাশে বসে অবরে সবরে গাড়ি চালানো শিখত কলকাতার নির্জন রাস্তা-ঘাটে।

আরে বাঃ! প্রথম দিনেই ভাল লেগে গেল গৌরহরির। গাড়ির যন্ত্রপাতিগুলো খুব একটা জটিল না তো! কিংবা হয়তো জটিলই, কিন্তু তার কাছে এই প্রথম একটা কাজ এল যে কাজ তার পারব না' বলে মনে হ'ল না। ব্যাপারটা এরকমই হয়, দুনিয়ার সবচেয়ে অপদার্থ লোকটারও একটা না একটা বৈশিষ্ট্য মাফিক কাজ আছে, সেটা খুঁজে পেলে বিস্তর বখেরা চুকে যায়। গৌরহরি তার দুটো রুখে-শুখো হাত-পা আর মগজের ঝমঝম নিয়েও মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতির মধ্যে সম্পূর্ণ সেঁধিয়ে গেল। কেমন যেন নেশা পেয়ে বসল

তাকে। একমাসে সে গড়গড় করে গাড়ি চালাতে লাগল। পিছনের সিটে বসে তার কান্ড দেখে বগলাপতি হেসে খুন, আরে বাঞ্চোত, খুব শিখেছে তো! অ্যাঁ! আরে বাঃ! এ যে মোলায়েম ব্রেক মারে। ডাইনে বাঁয়ে হাত দেখিয়ে বাঁক নেয়! অ্যাঁ! এ যে দিব্যি স্পিডও মারছে।

বাবা আর মাকে কয়েকদিন সে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, পানিহাটি ঘুরিয়ে আনল। মাস চারেক পর হরিপদকে বিদায় দেওয়া হল। যাওয়ার সময়ে হরিপদ আড়ালে ডেকে বলল, ছোটবাবু, তুমি মাইরি এক নম্বরের টিকরমবাজ। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি তোমার মত হাফ-ফিনিশ লোক ব্যাপারটা কোনওকালে শিখতে পারবে। ভাবলে কি শেখাতুম! ঠিক গোলেমেলে হরিবোল করে দিতুম।

ডানদিকে প্লিমাউথ, পিছনে ফিয়াট, বাঁদিকে পার্ক করা কয়েকটা অ্যামবাসাডার, সামনে মিছিল, বিচিত্র গাড্ডা। ভিতরে বসে বাতাসহীনতায় ঘামতে লাগল গৌরহরি। ছেলেটা নেমে যাওয়ার পর সে লাল শালুর টুকরোটা দিয়ে মিটার ঢেকেছে। এখন নো সোয়ারি বিজনেস। বগলাপতির ছেলে গৌরহরি, অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা গৌরা কি কারও সার্ভেন্ট? ইজ হি? এই বলে গৌর গাড়ির ছোট চৌকো আয়নায় নিজের মুখখানা দেখল। সদ্বংশের ছেলেদের মুখে কিছু কিছু চিহ্ন থাকে। তার মুখেও আছে। এই যেমন তার কপালখানা, কেমন গড়ানে, মাঝখানে মাথার চুল ছুঁচোলো হয়ে নেমে এসেছে। কিংবা, যেমন তার দু'খানা কান, দুটিতে বুদ্ধদেবের মূর্তির কানের মতো ভারী ভারী বড় লতিতে কানদুটো বাহারে দেখায়। নাকখানাও চোখা। আর কিছু লক্ষ করার মতো নেই অবশ্য। গাল ভাঙা চোয়াড়ে চেহারা, গালে কয়েকদিনের দাড়ি। রুখু চুল। একটু গোঁফ আছে গৌরের। সেখানে আজকাল চিকমিকে দু'-একটা পাকা রোঁয়া মাঝে মাঝে দেখা যায়।

শালা প্রাইভেটটা যদি ডানদিকে না থাকত তবে এতক্ষণে দাশ কেবিনে গিয়ে টিফিন করত গৌরহরি। সে ঘড়ি দেখল। হ্যাঁ, এখন গৌরবাবুর টিফিন টাইম পেরিয়ে যাচ্ছে। গৌরবাবুর খিদে পেয়েছে আর এ শালারা রাস্তা আটকে এ সব কী টিকরমবাজি শুরু করেছে! অ্যাঁ! গৌরবাবুর খিদে পায় না নাকি? ডানদিকের ওই শালা প্রাইভেটটা! কালো চশমা-পরা

লোকটা থুতনিতে হাত দিয়ে ঝিমোচ্ছ। খিদে পেলে গৌরের ঘুম আসে। বাবুদের বাড়ির ছেলে, খিদে তেষ্টা সে একদম সইতে পারে না। সে হল গে টিকাটুলির ডাকসাইটে বগলাপতির ছেলে গৌরহরি, অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা গৌরা, খিদে তেষ্টা সইতে নারে-ছারারা-রা-রা, গুনগুন করে গান গাইল গৌর। আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে গাল দিল দুনিয়ার সব প্রাইভেটদের, আর মিছিল করা যাবতীয় ভুখখা পাটির লোকদের। গৌরবাবুর গাড়ি আটকে শালাদের যত আশনাই!

একটা টেরিলিন পরা লোক জানালায় বুকে বলল, গাড়ি যাবে নাকি?

কোথা দিয়ে যাবে দাদা? উড়ে?

মিছিল তো শেষ হয়ে এল। রাধা সিনেমার কাছে পুলিশের গাড়ি দেখা যাচ্ছে, ওই তো শেষ।

গাড়ি যাবে না দাদা, আমার টিফিন হয়নি।

লোকটা একটু শ্বাস ফেলে বলে, আপনি মালিক, আপনার দয়া।

বলে সরে গেল।

মালিক! আলবত মালিক। গৌরবাবুর টিফিন হয়নি আর গাড়ি যাবে বললেই যাবে। কে না জানে বিশ্বসংসারে যে, বিকেল সাড়ে চারটেয় চা না পেলে গৌরবাবুর ঘুম পায়! স্টিয়ারিং-এর ওপর মাথা ঝুঁকে আসে! তখন নিজেকে কত কাকুতি মিনতি করে গৌর, ওঠো গৌরবাবু, ওঠো, অমন হেঁদিয়ে পড়লে কি চলে? ওঠো বাবা, গৌর, ওঠো। চোখ মেলে তাকাও তত বাপধন। নইলে যে কখন লাল আলো পেরিয়ে যাবে। কোন গাড়ির পিছনে ভিড়িয়ে দেবে, আর ধরবে এসে পুলুসবাবা। ওঠো হে বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি। জেগে থাকো হে বগলুর ছাওয়াল,

তবু শালার ঘুম পায়! আড়মোড়া আসে। দাশ কেবিনের চা কড়া, গৌরের চা আরও কড়া করে দেওয়া হয়। সঙ্গে থাকে বিস্তর কাঁচা লঙ্কার কুঁচি মেশানো রগরগে গরম অমলেট আর টোস্ট। শালার টোস্টে মাখনের বদলে লাড় লাগানো। এইসব খায় গৌর, আর বলে, খেয়ে নে বাবা গৌর, এই শেষ খাওয়া রে। এই অমলেট ভেজেছে মবিল অয়েলে, পাউরুটিতে চর্বি, আর শুকনো চোতরাপাতার কাথ দিয়ে হয়েছে এই চায়ের লিকার, আফিমের জল মিশিয়ে খেয়ে নে বাবা গৌর, তোর শেষ খাওয়া।

তারপর রুমালে মুখ মুছে মৌরি চিবিয়ে আবার নিজেকে বলে, না বে, মরবি না। তোর ঠাকুন্দা খেত মুক্তাভস্ম, তোর বাবা খেত স্বর্ণসিন্দুর, তোরা রুপোর গেলাসে জল খেয়ে বড় হয়েছিস। বিস্তর সোনারুপো মুক্তো হজম করা পেট তোর, সেই পেটের কী করবে রে শালার চোতরাপাতার কাথ, কিংবা চর্বি, কিংবা মবিল অয়েল? সব হজমে দে শালা, সব হজমে দে, যা খাবি সব হজমে দিয়ে বসে থাকবি, কেউ যদি এসে বাতাপী' বলে ডাক দেয়। ঘাবড়াবার কিছু নেই, বাতাপী আর বেরোবে না।

মিছিলের লেজ ভেসে যাচ্ছে। পিছনে পুলিশের কালো গাড়ি। তারপর রাস্তা ক্লিয়ার। স্টার্ট, গৌরবাবু। মাথাটা সত্যিই ঘুমে ভরে আসছে। ঘুম যেন ঠিক জলের মতো, টল টল করে আর তার মধ্যে নানা টুকরো-টাকরা স্বপ্ন মাছের মতো ঘাই মারে। যখন এরকম হয় তখনই গৌরহরির সামনে উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে নানা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যেতে থাকে। গৌর দেখে, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে ট্রাফিক পুলিশটা বুড়িগঙ্গার ধারের সেই কামানটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কখনও বা হঠাৎ গৌর আচমকা ব্রেক চেপে ধরে বলে, আরে সাবাস, এখানকার রাস্তাটা কেটে কবে খাল বানিয়েছে। শালারা! তারপর চোখ কচলে দেখে, কোথায় খাল, রাস্তাই তো! কিংবা কখনও বা দেখে সামনের রাস্তায় অনেক রঙিন বল ভাসছে, লোকজন উড়ে উড়ে যাচ্ছে। রাস্তাটা হঠাৎ যেতে যেতে আকাশমুখো খাড়া উঠে গেছে। ঘুম পেলে গৌরহরির এরকম সব হয়। তখনই দাশ কেবিনের সেই চোতরাপাতার কাথ না হলে, ওরা কি বাস্তবিক আফিঙের জল মেশায় নাকি! নইলে গৌরের এরকম হবে কেন? কলকাতার যেখানেই থাকুক গৌর, একটা না একটা সময়ে, প্রায়ই বিকেলের দিকে

ওই অদ্ভুত ঝিমুনি আসতে থাকে তার। আর এলেই পাগলের মতো সে লাল কাপড়ে মিটার ঢাকে, তারপর ভোঁ ভোঁ করে চালিয়ে দেয় দাশ কেবিনের দিকে। পৃথিবীর এক এবং অদ্বিতীয় দাশ কেবিন।

ও বাবা পুলুস, ও পুলুসবাবা!—গৌর নরম গলায় বিড়বিড় করে ডাকে, হাতটা একনাগাড়ে তুলে রাখলে যে ভেরে যাবে বাবা। হাতটা একটু নামাও। আমরাও তো যাব বলেই রাস্তায় বেরিয়েছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার পিছনখানা দেখলে তো চলবে না বাবা, গৌরবাবু যে এখনও চা খায়নি, তার যে টিফিন টাইম, রাস্তাটা একটু ছাড়ো বাবা পুলিশ।

অবশেষে ট্রাফিক পুলিশ হাত নামায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তা খুলে দেয়।

আই বাবা পুলুস, তোমার পায়ে পায়ে দণ্ডবৎ। দরগায় শিন্নি, বাবার গির্জেয় মোমবাতি, এই মৌতাতটার সময়ে আর আটকে রেখে মেরো না।

এই ট্যাক্সি।

গেরোর পর গেরো। শালা সার্জেন্ট।

গৌর গাড়ি থামায়। কোমরে পিস্তল-ওলা সার্জেন্টটা এগিয়ে আসে। খামোকা হাত বাড়িয়ে বলে, লাইসেন্স দেখি।

এসব ফালতু বদমাইশি।

কী করতে হবে স্যার, বলুন না।

সার্জেন্টটা ধমক দেয়, বদমাইশির আর জায়গা পান না। শিগগির ওই লাল কাপড় খুলুন। এই ভদ্রলোক পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছেন ট্যাক্সির জন্য। শিগগির খুলুন।

খুলছি পুলুসবাবা, খুলছি। কিন্তু আমার যে টিফিন হয়নি। মিছিলের হুজ্জতে হড়কে গেছে টিফিন টাইম। গৌরবাবু যে হেঁদিয়ে পড়ছে বাবা পুলুস!

গৌর বিড়বিড় করে লাল কাপড় খুলে নেয়। বুড়োমতো লোকটা সবিনয়ে দরজা খুলে গাড়িতে ঢোকে। জানালা দিয়ে মুখ বার করে সার্জেন্টকে বলে, ধন্যবাদ, আপনি না থাকলে কিছুতেই ট্যাক্সি পেতাম না। সবেতে লাল কাপড়। নয়তো মিটার ডাউন। আচ্ছা চলি।

সার্জেন্টটা হাসে তৃপ্তির হাসি। জানালায় কুঁকে গৌরকে বলে, ঠিকমততা নিয়ে যাবেন। রাস্তায় যেন আবার ব্রেকডাউন না হয়। আমি কিন্তু নম্বর টুকে রেখেছি।

দরগায় শিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি, শালার পুলুস যেন না ছোয় গৌরবাবুকে। নিয়ে যাবে, পুলসবাবা, ঠিক নিয়ে যাবে। কিন্তু এখন যেন কেমন রাস্তাগুলো খালের মতো লাগে, ঢাকার কামানটা এসে বসে থাকে চৌরাস্তায়, রঙিন বল ভাসে বাতাসে, মানুষগুলো উড়তে থাকে, রাস্তা উঠে যায় আকাশমুখে খাড়া হয়ে, গৌরবাবুর চায়ের টাইম যে হড়কে গেছে বাবা!

কোথায় যাবেন?

পি জি।বুড়োটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে।

দরগায় শিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি, তবু ভাল, দক্ষিণে। যদি উত্তরে হত। আর যদি দাশ কেবিন থেকে আরও দূরে কোনও গাড্ডায় বেঘোরে নিয়ে ফেলত বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরিকে, বগলুর গোলা গৌরাকে!

রাস্তাগুলো এমন সব জলে ডোবা, আবছা আবছা, রঙিন রঙিন গোলার মতো বল ছুঁড়ে দিচ্ছে ঢাকার সেই কামান। চৌরঙ্গির ট্রাফিক পুলিশ আড়বাঁশিতে পূরবী ধরেছে, দুটো পা কদমতলায় শ্রীকৃষ্ণের কায়দায় ক্রস করা, চারপাশে মুগ্ধ গাভীর মতো ভিড় করে এগিয়ে আসছে গাড়ির পর গাড়ি, গোর চোখ মুছে নেয়। কোথায় যেন যাচ্ছে সে? ওঃ হ্যাঁ, পি

জি। পিছনের সিটে বুড়োটা আছে তো ঠিকমতোবুড়ো মানুষদের বিশ্বাস কী! কখন আছে, কখন নেই। সার্জেন্টটা নম্বর টুকে রেখেছে।

গৌর ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, আপনি ঠিক আছেন তো স্যার? কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

অসুবিধে!-বুড়োটা খাক কবে ওঠে, কীসের অসুবিধে!

গৌর ভারী মুশকিলে পড়ে। সত্যিই তো, অসুবিধে কীসের! ল্যান্ডমাস্টারের গভীর গদি। চারদিকে শরতের রোদ মজা বিউটিফুল বিকেল, চৌরঙ্গির মতো জায়গা দিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, তবে আর অসুবিধে কীসের? অসুবিধে যা, তা তো গৌরের। এই শালা রিয়্যালিটির সঙ্গে কে যেন স্বপ্নের ভেজাল দিয়ে দিচ্ছে, চামচে নেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছে এমন যে আর আলাদা করা যাচ্ছে না, কোনটা শালার রিয়্যালিটি, আর কোনটা ড্রিম।

সে একটু আমতা আমতা করে বলে, অসুবিধে আর কী! আপনার বয়সটাই যা একটু গোলমেলে। এই বয়সে বুঝলেন, যখন তখন যা তা হয়ে যেতে পারে।

কী রকম!

গৌর একটু ইতস্তত করে বলে, এই কয়দিন আগেও আপনার মতো এক বুড়ো মানুষকে তুলেছিলুম। মাঝরাস্তায় ডাইরেকশন জিজ্ঞেস করতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, ঘাড় লটকে নেতিয়ে আছে। থ্রম্বসিস। তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হল, তাই বলছিলুম কোনও অসুবিধে ফিল করলে বলবেন।

পি, পি, পা, পা গাভীর ডাক। চলো বাবা গৌর, পুলুসবাবা হাত দেখাচ্ছে। চোখে সবুজ মারছে ট্রাফিকের আলো। চলল হে বগলাপতির ব্যাটা পি জি। মনে থাকে যেন সার্জেন্ট শালা নম্বর টুকে রেখেছে, দেবে'খন ঠুকে!

কোথায় যেন যাবেন স্যার।

বললাম যে পি জি!

আই। ঠিক। পি জি। চলো বাবা গৌর। বুড়োর গল্পটা সে সম্পূর্ণ বানিয়ে বলল। এমনিই। আসলে বুড়োটাকে সাবধান করে দিল, যেন তার গাড়িতে বসে হঠাৎ বুড়োর মরার শখ না হয়।

যখন কখনও গৌরহবি একা একা তার ট্যাক্সি নিয়ে বসে থাকে, প্রায়ই দুপুরের দিকে হঠাৎ হঠাৎ তার কেমন অদ্ভুত ব্যাপার সব মনে হয়। মনে হয় পিছনের সিটে একটা মৃতদেহ বসে আছে। মাঝেমধ্যে অনেক রাতে নাইট শোর ট্রিপ মেরে গ্যারাজ করার সময়ে তার সুস্পষ্ট মনে হয় রাস্তার টালে গাড়ি লাফিয়ে উঠতেই লাগেজ বুটে কী যেন নড়ল। সে যেন এক মৃত মানুষের শরীর। কে যেন কখন অলক্ষিতে মালটি তার ঘাড়ে পাচার করে গেছে। কত দিন এমন হয়েছে। গৌর গাড়ি থামিয়ে সত্যিই লাগেজ বুট খুলে দেশলাই জ্বেলে খুঁজে দেখেছে। খুঁজেছে পিছনের সিটে, মেঝেয়। কোথাও কিছু নেই। তবু মাঝে মাঝে দুপুরে কি নিশুত রাত্রে গাড়ি চালাতে চালাতে তার এই রকম আজও মনে হয়। একটা মৃত লোক বসে আছে পিছনের সিটে ঘাড় লটকে, লটপট করছে দুলুনিতে। কিংবা কারা লোড করে দিয়ে গেছে লাগেজ বুটে হাত পা বাঁধা ডেডবডি। তখন যে মৌতাতের সময় তা নয়। এমনিতেই সহজ স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়েছে। গৌর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছে পিছনের সিট। গাড়ি থামিয়ে খুঁজে এসেছে লাগেজ বুট।

তাই গাড়ি চালাতে চালাতে মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে গৌর। বুড়োটা বসে আছে বাইরের দিকে চেয়ে! খুব বুড়ো নয় লোকটা, তবু মরার কি কোনও বয়স আছে? মৰলেই হল।

গৌর মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস কবে, পি জি-তে কী ব্যাপার স্যার! কারও অসুখ?

আমার মেয়ে। ডেলিভারি কেস।

বাঃ বাঃ। কী হল! নাতি না নাতনি?

হয়নি। আজকালের মধ্যেই হওয়ার কথা। পেইন উঠেছে কাল বিকেল থেকে।

আজকালকার বাচ্চা তো! জন্মের আগে থেকেই জ্বালাতে শুরু করে, শেষ জীবন তক জ্বালায়।

আসলে এসব কথার কোনও মানে নেই। খামোখা বলে যাচ্ছে গৌরহরি। তার সন্দেহ, বুড়ো মানুষটা যদি হঠাৎ কেঁসে যায় স্ট্রোক-ফোক হয়ে, আর সে হয়তো টেরও পেল না, ওদিকে সার্জেন্টের কাছে তার নম্বর টোকা, তাই কথায় কথায় সে বুড়ো মানুষটার বেঁচে থাকার প্রমাণ সংগ্রহ করতে থাকে।

গাড়িটা সে কিনেছিল এক পাঁইয়ার কাছ থেকে। সেই পাঁইয়ার কাছেই গাড়িটার দোষ ধরেছিল। কোনও অপঘাত ঘটেছিল গাড়ির মধ্যেই। তারপর থেকেই এ গাড়িতে একটা ভৌতিক ব্যাপার চলেছে। কেবলই ওই মৃতদেহ টের পায় গৌর। শালার পাঁইয়া পোড়ো গাড়ি ঠকিয়ে বেচে গেল ন' হাজারে, কিনল বগলুর পোলা গৌরা।

ডজটা পেলে এসব ঝামেলা হত না। সেটাতেই সে শিখেছিল গাড়ি চালানো।

হরিপদ চলে যাওয়ার পর বাবা বগলাপতি ছেলে গৌরহরিকে দেড়শো টাকায় সোফার রাখলেন। গৌর আপত্তি করল, হরিপদ তো রাত্রে থাকত না। আর আমি চবিবশ ঘণ্টার ড্রাইভার।

শালার টনটনে বুদ্ধি দেখ! আচ্ছা যা, একশো পঁচাত্তর পাবি, তার বেশি কিছুতেই না। বলেছিলেন বগলাপতি, বগলু, গৌরের বাবা।

গৌর একশো পঁচাত্তর পেত, প্লাস খাওয়া-দাওয়া, জামাকাপড়, ঘরদোর। মা কেবল দুঃখ করে বলত, এ রকম কান্ড জন্মে শুনিনি, ছেলে নাকি বাবার চাকরি করে।

বাবা বগলাপতি বলত, তবুও তো বাবার চাকরি করে। তাতে মানসম্মানের হানি হয় না। যা ছেলের সুরত তোমার, অন্য জায়গায় হলে কী কান্ড যে হত!

তা গৌর গাড়ি চালাত। বাবাকে নিয়ে যেত এখানে সেখানে। ব্যাবসাপত্রের নানা ধান্ধায় ঘুরতেন বাবা। আস্তে আস্তে জমিয়ে নিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে তাকে ডেকে বলতেন, তোর হাতে গাড়ি থাকলে আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বেশ তো চালাস রে! অ্যাঁ! বেশ তো হাত তোর! দিব্যি চালিয়ে নিচ্ছিস কলকাতার রাস্তাঘাটে। অ্যাঁ! পাকা হয়ে গেছিস বেশ।

এ সবই গ্যাস। গৌরহরি বুঝত। কেননা পিছনের সিটে বসে বাবা বিস্তর টাকাপয়সার লেনদেন করতেন নানা পার্টির সঙ্গে। গোছ গোছ নোট বেহাত হত। আসত তার বাবার পোর্টমান্টোতে। খুশি হত গৌর। বড়দা কেটেছে। এখন যা আসবে একদিন তার অর্ধেক বখরা পাবে সে, যদি না ইতিমধ্যে মেজদাও কাটে। গৌর সেইসব টাকাপয়সার হিসেব বুঝত না। কিন্তু ছোট্ট আয়নাটা দিয়ে টাকার ছবি সে দেখেছে বিস্তর। বাবা বগলাপতি সেটা বুঝতে পেরে গৌরকে অন্য কথায় ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু গৌর তখন টাকা চিনেছে। অঙ্কের হিসেব না বুঝলেও এটুকু জানা ছিল যে টাকা নিয়ে বিস্তর কাজ হয়। টাকার শক্তি অসম্ভব।

তাই সে মাঝে মাঝে বাপ বগলাপতির দিকে চেয়ে অকুতভাবে হাসত। একটু টের হাসিটি, চোখদুটি মিটমিট করত, গরগরে একটা শব্দ হত গলায়। এইসব দেখে বগলাপতি সাবধান হয়ে যেতেন। বলতেন, এ সবই তো তোদের জন্য। বড়দা উচ্ছন্নে গেল, এখন তোদের দুটোকে যদি একটু রেখেটেখে যেতে পারি।

গভর্নমেন্টের কন্ট্রাক্টর বগলাপতি। তখন বিস্তর বালি মেশাচ্ছেন সিমেন্টে। না মিশিয়ে উপায়ও নেই। গভর্নমেন্টের লোকেদের খাওয়াতে খাওয়াতে কিছুই থাকে না প্রায়। বগলাপতি ব্যাবসা জানতেন হাতের উলটোপিঠের মতো। কলকাতার বাজার ছিল নখদর্পণে। কোন মালের কত স্টক আছে বাজারে, কতদিনের মধ্যে সেই মালের চালান আর আসবে না,এসবই প্রাচীন কবিরাজের নাড়িজ্ঞানের মতো টনটনে ছিল তার। একবার

ইচ্ছে করেই একটা মালের টেন্ডারে উঁচু রেট দিলেন। তারপর বাজারের সব মাল কিনে মজুত করলেন গুদামে। তারপর মিটিমিটি হাসতে লাগলেন আপনমনে। আয়নায় গৌরহরি সেই হাসি দেখত। মাঝে মাঝে আপনমনে বলতেন, বুঝলি গৌর, মালটা বছর খানেকের মধ্যে আর আসছে না বাজারে। গৌরকে সম্বোধন করে বলা, কিন্তু আসলে বলা নিজেকেই। টেন্ডার বগলাপতি পেলেন না বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে পেল সে বাজার ঘুরে মাথায় হাত দিয়ে বসল। গভর্নমেন্টের কন্ট্রাক্ট, সিকিউরিটির টাকা জমা দেওয়া আছে, পিছোবার উপায় নেই, ওদিকে মাল নেই এক কণাও। মাল কোথায়! মাল কোথায়! লোকটা যখন পাগল পাগল, ঠিক সেই সময় বগলাপতি তার কাঁধে হাত রাখলেন, আছে, মাল আছে। তবে লোকসানে তো দিতে পারি না। এই আমার রেট। বলে রেট দেখালেন। লোকটা ডজ গাড়ির পিছনের সিটে বসে বগলাপতির পা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে বলল, দাদা, আর একটু কমান। আমি যে গভর্নমেন্টকে ওর চেয়ে চার আনা কম রেট দিয়েছি। লাখ লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট, এত লস হলে চিরকালের মতো শেষ হয়ে যাব। বগলাপতি হাসেন, তবু তো জেল থেকে বাঁচবে! অবশেষে বগলাপতি রেট কমিয়েছিলেন। লোকটা প্রতি ইউনিটে দু'পয়সা ক্ষতি করে মাল নিল। বগলাপতি কয়েক লাখ কামালেন। একা একা পিছনের সিটে বসে গৌরকে ডেকে বললেন (আসলে নিজেকেই বলা), বুঝলি গৌরা, বাঘকে যদি ধরতে না পারিস, ঘোগকে ধরিস। বাজারটাকে হাতের মুঠোয় না রাখলে কি ব্যাবসা চলে?

গৌরের মাইনে বেড়ে দুশোয় দাঁড়াল। সে সারাদিন গাড়ি নিয়ে থাকত। ইঞ্জিনটা সে খুব ভাল চিনত, যেমন বাজার চিনতেন বগলাপতি। ইঞ্জিনের একটু সর্দিকাশি, একটু ফাস শব্দ থেকেও গৌর তার গোলমাল বুঝে নিত। সারাদিন সে গাড়িখানার পিছনে খাটত। মাটিতে শুয়ে ইঞ্জিনের তদবির করত সারাদিন। গাড়ি ধোয়াত, মুছত। ঝকঝকে রাখত সবকিছু বগলাপতি দুরে দাঁড়িয়ে ঘাড় এধারে ওধারে কাত করে পুরনো গাড়িখানার শোভা দেখতেন। আর বলতেন, বাহাঃ রে গৌর, বাহাঃ। প্রশংসাটুকু খুব উপভোগ করত গৌরহরি। এতদিন বাদে সে এমন একটা কাজ পেয়েছে যে কাজ তার উপযুক্ত। যে কাজ তাকে মানায়। সে তাই জান লড়িয়ে দিয়েছিল। ওই গাড়িখানার যত চমক-ঠমক ততটাই

তার হাতযশ ততটাই তার গুণ। গৌরহরি পুরনো ডজখানাকে জড়িয়ে ধরে লতিয়ে উঠেছিল। সে যখন গাড়ি চালাত তখন মন-প্রাণ দিয়ে কোনওদিন তার হাতে গাড়ি ঘষাটাও খায়নি। স্টিয়ারিং-এ বসলেই তার হাত পা মগজ চোখ সব ধীরে ধীরে অধিকার করে নিত গাড়ির যন্ত্রপাতি। সে হয়ে যেত গাড়িটা স্বয়ং। তখন গৌরহবি না গাড়ি, তা বোঝাও যেত না।

তা গৌরহরি মাঝে মাঝে গাড়ি হয়ে যায়। তখন আর সে মানুষ থাকে না। ভুলেই যায় যে সে গৌরহরি, বগলাপতির ব্যাটা, অর্থাৎ কিনা বগলুর পোলা।

বগলাপতি তখন স্টোরিং এজেন্ট। বিস্তর ঝামেলার কাজ। অনেক বখেরা। ঠিকমতো চালাতে পারলে লাভও বিস্তর। বগলাপতির তখন হাই-ব্লাডপ্রেশার। সহায়-সম্বল বলতে হাফ-ফিনিশ গৌরহরি আর কর্মচারীরা। মেজো ছেলে রাখোহরি বিলেতে যা পড়তে গিয়েছিল তা শেষ না করে আর একটা কী পড়তে লেগেছে। আসলে পড়ার নাম করে বাপের পয়সায় ফালতু কিছুদিন বিলেতে থেকে যাওয়া। ইতিমধ্যেই সে টাকার বরাদ্দ কয়েকবার বাড়িয়ে নিয়েছে। ফুর্তি লুটছে খুব। বড় ছেলে থাকোহরি সে সব কথা মাঝে মাঝে জানাত। সে নিজেও ফুর্তি লুটেছিল। তাই রেখে-ঢেকে লিখত। যেটুকু লিখত না বুদ্ধিমান বগলাপতি আন্দাজ করে নিতে পারতেন। গভর্নমেন্টের স্টোরিং এজেন্সি পেয়ে বগলাপতি যখন ফ্যাসাদে পড়লেন তখন বিস্তর পয়সা খরচ করে তার করলেন মেজো ছেলেকে গৌরহরির নামে, ফাদার সিক, কাম শার্প।

রাখোহরি চলে এল। পুরোদস্তুর সাহেব। বিলেতে সে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট শিখেছে কয়েক বছর। পাস করেনি, কিন্তু যা পড়েছে তার দাপটেই ম্লান হয়ে গেলেন বগলাপতি। রাখোহরি বিশাল জাল ছড়াল চারদিকে। আসলে জালটা টাকার। রাখোহরির বুদ্ধিটা যে খুব খারাপ ছিল তা নয়। অমনিতে সে ছিল মিষ্টভাষী, বিনয়ি এবং ছোটখাটোর মধ্যে সুপুরুষ, নেভি ব্লুস্যুট আর বো পরলে তাকে বড় সুন্দর দেখাত। কতবার ফার্পো কি গ্র্যান্ড কি মোকাম্বাের পার্টিতে ডজে চড়িয়ে তাকে নিয়ে গেছে গৌর। অল্প ক'দিনেই গৌর রাখোহরির ভক্ত হয়ে পড়েছিল। রাখোহরির যোগাযোগটা ছিল মিনিস্টার আর

সেক্রেটারিদের লেভেল-এ। অল্প কয়েকদিনেই সে এজেন্সির ব্যাপারে বিস্তর সুবিধে আদায় করে নিল। তার পক্ষে এবং পিছনে বড় বড় মহারথী দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু যাদের সঙ্গে দৈনিক কাজ-কারবার সেইসব ইনস্পেক্টর, ঠিকাদার, দারোগা ইত্যাদিকে একদম গ্রাহ্য করত না সে। তাদের ওপর দিয়ে চলত। রাখোহরির বিশাল বিশাল লোকের সঙ্গে ভাব দেখে তারাও সহ্য করত মুখ বুজে। বগলাপতির আমলে তারা কিছু পয়সাকড়ি রোজগার করেছিল, রাখোহরির আমল্পে দেখা দিল উলটো, তাদের চাকরির ভয়। কিংবা বদলির। বগলাপতি রাখোহরিকে বোঝানোর চেষ্টা করত, বাবা, এরা সব খুদে দেবতা, এদেরই সঙ্গে কাজকারবার, এদের একেবারে পায়ে ঠেলো না। মিনিস্টার, সেক্রেটারির বদল হয় কিন্তু এদের হয় না। কারবারে ঘুরেফিরে এদের সঙ্গেই দেখা হবে। ছোট মানুষ সব, তোমাকে ভয়ও পায়, কিন্তু জোট বাঁধলে তোমাকে আমাকে দেশছাড়া করবে। রাখোহরি তখন গরম। বাপের টাকায় তখন ব্ল্যাঙ্ক চেক কেটে দেওয়া আছে তার নামে। স্টোরিং-এ বিস্তর ডিমারেজ দেখিয়ে সে মাল পাচার করছে। ইন্সপেক্টর, ঠিকাদার, দারোগা সবাই হাঁ করে দেখছে। সবাই ওরকম করে, কিন্তু তারা ভাগ পায়, রাখোহরির আমলে তাদের ভাগ নেই। রাখোহরি ফুড স্টোরিং-এর প্রায় একরারনামা পেয়ে গিয়েছিল। অ্যান্টিকরাপশান তার পিছনে ঘোরে, তার নামে রিপোর্টও যায়। কিন্তু তা সব চাপা পড়ে থাকে। বগলাপতি নীরবে একা ঘরে বুক চাপড়ান। রাতারাতি উন্নতি দেখে তিনি ভেঙে পড়েন, আর বলেন, বুঝলি গৌরা, ভিত না গেঁথে বাড়ি উঁচু করার অনেক বিপদ। ভিতটাই যে কাঁচা। এ ছেলেটা যে বোঝেই না দারোগাকে খাতির করা দরকার। ইন্সপেক্টরকেও পান-তামাক দিতে হয়। আমরা ছেলেবেলা থেকে এসব শিখেছিলাম। বিপদে-আপদে এরা যে কত কাজে আসে।

রাখোহরি তখন একটার পর একটা কন্ট্রাক্ট নিচ্ছে। প্রায় সবই সরকারি। তখন আলাদা মেজাজে চলে। কিন্তু তখনও ডজ গাড়িটার বশংবদ ড্রাইভার হয়ে পরমানন্দে গাড়িখানা চালায় গৌরহরি। সে উন্নতি ভাল বোঝে না, কেবল আনন্দ বোঝে। রাখোহরি যখন মোকাম্বাের ভিতরে স্বপ্ন-আলোয়। নাচে গায়, গ্র্যান্ডে পার্টি দেয়, তখন গৌরহরি সযত্নে পালকের ঝাড়নে ডজ গাড়িখানা বার বার মুছছে আর মুছছে। ওই তার আনন্দ, সুখ,

সম্পদ। অল্প একটু মাতাল হয়ে বেরিয়ে আসে রাখোহরি, ইংরিজিতে কথা বলে বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে, বিদায় নেয়। গৌরহরি গাড়ির দরজা খুলে ধরে। থাকে। সযত্নে গাড়ি চালিয়ে রাখোহরিকে নিয়ে আসে। বগলাপতি জেগে অপেক্ষা করে থাকেন। গৌরহরিকে ডেকে রাখোহরির গতিবিধির খবর নেন, ব্যাবসাপত্রের অবস্থা বুঝবার চেষ্টা করেন। গৌরহরি বুঝতে পারে, একটা গোলমাল পাকাচ্ছে। কিন্তু সেটা কেমন গোলমাল তা তার মাথায় আসে না, সে যা দেখে তাই বলে দেয় বগলাপতিকে। বগলাপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকেন। মাঝে মাঝে বলেন, বড়গাছে নৌকো বাঁধবার চেষ্টা। গৌরা, এবার তোর জন্য আলাদা বন্দোবস্ত করতেই হচ্ছে। সবংশে রাখোহরি যদি ডায়, তুই কেন মরবি? তুই আলাদা ব্যবস্থা করে নে। তোর জন্যই রাতে আমার ঘুম নেই।

.

পি জি-তে গাড়ি ঢোকাল না গৌর। বাইরেই ছেড়ে দিল বুড়ো লোকটাকে। লোকটা খুব সাবধানি। ভিতরের পকেটে হাত চালিয়ে নোট বের করল, ঝুলপকেট থেকে খুচরো। যা ভাড়া টায়ে-টায়ে তা-ই দিল, খুচরো ফেরতের কোনও ঝামেলা রাখল না। একজ্যাক্ট ফেয়ার। বাহাঃ রে বাহাঃ!

স্যার, ওই সার্জেন্ট কি আপনার কেউ হয়? হলে নম্বরটা কেটে দিতে বলবেন। আমি তো ঠিকমতোই পৌঁছে দিয়েছি আপনাকে! দিইনি?

বুড়োটা খ্যাঁক করে ওঠে, সার্জেন্ট আমার বাবাকেলে আত্মীয় হয় আর কি! নম্বর টুকেছে তো আমি কী করব? তোমাদের বদমাইশি কে না জানে? দেয় যদি ঠকে তো ঠিকই করবে। উচিত শিক্ষা হওয়া দরকার। লোকে বিপদের সময়ে ট্যাক্সি পায় না, আর তোমরা নানা কাজে ট্যাক্সি ভাড়া খাটাও। গভর্নমেন্টের পুষ্যিপুত্তুর সব!

বুড়োটা বকবক করতে করতে কাটল।

শালা! গৌরবাবুর টিফিন টাইম হড়কে দিয়ে আবার গরম খাওয়া হচ্ছে!

শালার ওই সার্জেন্ট না ধরলে গৌরবাবু কবে পিছলে বেরিয়ে যেত, তখন কী করতে বাবা বুড়ো মাল!

বিড়বিড় করতে করতে গৌরহরি আবার লাল কাপড়ে তার মিটার বাঁধে। একটা মেয়েছেলে দূর থেকে আঙুল দেখাচ্ছে, এই যে, এই ট্যাক্সি!

আর না বাবা। আর না। এবার দাশ কেবিন। সোজা নাক বরাবর। একচুল এধার ওধার হয়েছে তো গৌরহরির নামই গৌরহরি নয়। কারও সার্ভেন্ট নাকি বগলাপতির ছেলে? অ্যাঁ! তোমাদের পকেট গরম বাবা, সে তো বুঝতেই পারছি। মাসের প্রথম দিকটা তো, জানি। কিন্তু বাবা, আমি কারও পয়সায় কেনা চাকর নই। এই ল্যান্ডমাস্টার এখন প্রাইভেট প্রপার্টি। বগলাপতির ডজ গাড়িটার মতো। হ্যাঁ, আলবত, লাল কাপড়ে মিটার ঢাকার পর এখন এটা আমার প্রাইভেট। ফোটো সবাই, ফুটে যাও সব সোয়ারি। গৌরবাবুর টি-পার্টি আছে দাশ কেবিনে। ছাড়ো রাস্তা।

বদর-বদর। দরগায় শিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি, বাবা পুলুসে যেন আর না ধরে। পুলুসে ধরলে আঠারো ঘা।... অই দ্যাখো, শালাদের কারবার। রসা রোডটা বেমালুম গায়েব করে দিয়ে নদী বানিয়েছে! কেমন ঢেউ দিচ্ছে দেখো। কেমন কুলকুল শব্দ ঢাকার বুড়িগঙ্গার মতো। দোতলা একতলা স্টিমলঞ্চ যাতায়াত করছে দিব্যি। বয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে জল-পুলুস। লাল-নীল সবুজ বলগুলো উড়ে আসছে, উঠছে নামছে। দু-একটা এসে ধীরে ধীরে বসল গৌরবাবুর গাড়ির বনেটে। সেই বুড়ো লোকটা উড়ে আসছে পি জি হাসপাতালের দিক থেকে, চেঁচিয়ে বলছে, এই ট্যাক্সিওলা, আট আনা পয়সা বেশি চলে গেছে ভাড়ার সঙ্গে, পালিয়ো না, নম্বর টোকা আছে, সাবধান!

গৌর চোখ কচলে নেয়, কেমন ঘুমের আঁশ জড়িয়ে আছে চোখে। মাথার মধ্যে রিমঝিম শব্দ। ঠাহর করে সে রাস্তাঘাট বুঝবার চেষ্টা করে। নাঃ, রসা বোড় রসা রোডের মতোই

দেখাচ্ছে আবার। কেবল ওই রঙিন বলগুলো ঝামেলা করছে। উড়ে উড়ে আড়াল করছে উইন্ডস্ক্রিনটা, ওই তো পুলিশটার কাধে একটা নীল বল চেপে বসল।

নাঃ, ওটা গ্রিন লাইট। চলো হে গৌরবাবু।

গৌর তার খুদে ল্যান্ডমাস্টার একটা ডবলডেকারের গা ঘেঁষে উড়িয়ে নিল। দাশ কেবিন। আফিং মেশানো চোতরাপাতার কাথ না হলে আর এখন গৌববাবুর নার্ভ কাজই করবে না, পুরোটা ব্রেক ডাউন হয়ে বড়ি পড়ে যাবে।

গৌর ওড়ে। সত্যিই ওড়ে। তার স্পষ্টই মনে হয়, মাটির ছ' ইঞ্চি ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে তার গাড়ি, রাস্তার টালগুলো আর চাকায় লাগছে না। ভারী ভাল লাগে গৌরহরির। নিরন্তর রাস্তা আঁকড়ে চলতে কাহাতক ভাল লাগে রোজ? মাঝে মাঝে এই উড়ে যাওয়া কীরকম ভাল! গৌর খুশিতে শিস দেয়। তার গাড়ি উড়ছে, উড়ে যাচ্ছে।

সামনের আয়নাটা ঠিক করে নেয় গৌর। পিছনের ফাঁকা সিটটা নজরে রাখে। শালার ডেডবডিটা আছে ওখানে ঠিকই। কেবল সবসময়ে ওটাকে ঠাহর করা যায় না এই যা। মগন সিং-এর কাছে যখন ছিল তখনই শালা কোনও হুজ্জতে গাড়িটার গ্রহদোষ ঘটে গেছে। সেই অপঘাতের মড়া এখন সবসময়ে বসে আছে পিছনের সিটে। নয়তো নড়ছে লাগেজ বুটে। নড়বি তো নড় শালা, আমার কী! আমি তোরটা খাই, না পরি! আমি হচ্ছি গে বগলাপতির অর্থাৎ কিনা বগলুর ছেলে গৌরহরি, অর্থাৎ কিনা গৌরা। আমি শালা কার সার্ভেন্ট! লাল কাপড়ে মিটার ঢাকলেই এ আমার প্রাইভেট প্রপার্টি। এই দেখ, আমি গৌরা, নিজের প্রাইভেট গাড়িতে চলেছি দাশ কেবিনে। চা খাব। তুই মরা মানুষ, মরা মানুষের মতো থাকবি, নো ইন্টারফিয়ারেন্স। মড়াদের সঙ্গে জ্যান্তদের নো বিজনেস। মাগনা ট্যাক্সি চড়ছিস, এই ঢের। খবরদার যদি গৌরবাবুকে কখনও ভয় দেখিয়েছিস!

ভবানীপুর, কালীঘাট পেরিয়ে গেলে দাশ কেবিন আর খুব দূরে নয়। তবু, দেয়ার আর মেনি এ স্লিপস,। ফুটপাথে রং-বেরঙের মানুষের ভিড়। খালি ট্যাক্সি দেখলেই শালারা

হাত ওঠায়। মোড়ে লালবাতিতে দাঁড়িয়েছ কি, যেতে চাও বা না চাও, দরজা লক করা না থাকলে নিজেরাই খুলে ঢুকে পড়বে। একশো কারণ দেখালেও কাকুতি-মিনতি করতে থাকবে, বড় দরকার দাদা, একটু কাইন্ড হয়ে নিয়ে যান। বাড়তি পয়সা দেব। দেখছেন তো সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে। গৌর খেয়াল করে চলতি গাড়িতেই পিছনের দরজা দুটো হাত বাড়িয়ে লক করে দিল। এখন দাশ কেবিন ছাড়া কোথাও যাবে না গাড়ি। কেবল যদি ধরে বাবা পুলুসে তবে অন্য কথা। পুলিশকে বরাবর ডরায় গৌরহরি, যেমন রাত তার বাবা বগলাপতি। কত দারোগা যে তাদের বাড়িতে পাঁঠা খেয়ে ঢেকুর তুলে আশীর্বাদ করে গেছে। গৃহদেবতার মতো তাদের খাতির ছিল। যেদিন দারোগা খেত, সেদিন বগলাপতির ছিল সকাল থেকে বাঁধা উপোস। সেই সব ভয়-ভীতি থেকেই তাদের উন্নতি। সেটা কোনওকালে বুঝল না রাখোহরি। সে এসে দারোগাদের দাবড়াতে লাগল, ইন্সপেক্টরদের সঙ্গে চাকর-বাকরের মতো ছিল তার ব্যবহার। এই যেমন এখন গৌরহরির গাড়িখানা উড়ছে, ঠিক তেমনই উড়ত রাখোহরি। পুরনো দারোগা সমাদ্দার মাঝে মাঝে বগলাপতির কাছে দুঃখ করে যেত, তোমার ছেলের কাছে আর আমাদের পদমর্যাদা বলে কিছু রইল না হে বগলা। বগলাপতি তাকে হাত কচলে বলতেন, ও আমার ছেলে না। আমার রক্তের ধাতই নয়। ও ব্যাটা পেয়েছে ওর মামাবাড়ির ধাত। আমার শ্বশুরবাড়িটার ওই দোষেই কিছু হল না। ও শালা ওর মায়ের ছেলে, আমার না।

চুলকে ঘা করা। রাখোহরি তাই করেছিল। তার দুরের খুটির জোরে সে আশেপাশের সবাইকে মাটির ঢেলার শামিল করে দিয়েছিল। চুরি-চামারি যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। বাড়িতে এল রেডিয়োগ্রাম, রেফ্রিজারেটার, বগলাপতির ঘরে লাগানো হল এয়ারকুলার। তারপর ডজ গাড়িটা বেচতে চেষ্টা করতে লাগল রাখোহরি।

সেবার উত্তরবাংলায় বন্যার পর স্টোরিং এজেন্টদের খুব রবরবা দেখা দিল। হাজার হাজার টন খাদ্যশস্য মজুত হতে লাগল এজেন্টদের মারফত। রাখোহরির ছোটাছুটি গেল বেড়ে। সে কেবল গুদাম ভাড়া করে, আর মজুত করে মাল। লোডিং আনলোডিং-এর দরুন শস্যের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার একটা হিসাব ধরে শস্যের পরিমাণ বাদ দেয় সরকার। ধরে

করে সেই পরিমাণটা বাড়িয়ে নিয়েছিল রাখোহরি। সেটা ছিল হাতের মুঠোর আইনসঙ্গত ইনকাম। তার ওপর কমিশন আর হ্যান্ডলিং। এইসব নিয়ে রাখোহরি যখন ভীষণ ব্যস্ত তখন একদিন বগলাপতি গৌরহরিকে ডেকে পুরনো ডজ গাড়িটা বের করতে বললেন। তারপর সাজ-পোশাক পরে বেরোলেন। গৌরহরি গাড়ি চালিয়ে দিল। না, পুরনো ব্যাবসাপত্রের জায়গায় আর গেলেন না তিনি। তার নির্দেশে গাড়ি এসে থামল মগন সিং-এর গ্যারেজে। সেইখানেই ল্যান্ডমাস্টারখানা ছিল। প্রথমদিককার মডেল, খুব চাল গাড়ি। বগলাপতি ন' হাজারে কিনলেন গাড়িখানা। গৌরকে ডেকে বললেন, বুঝলি গৌরা, তোকে যা দেব ভেবেছিলাম তা আর বুঝি হল না। তা এই গাড়িখানা দেবই, এটায় তোর সারা জীবন চলে যাবে হয়তো বা, যদি ভাগ্যে থাকে। রাখোহরি সর্বনাশ আনল বলে। তা তুই অবোধ প্রাণী, সে গর্দিশে তোর কষ্ট পাওয়ার দরকার কী? যার যেমন গুণ তার তেমনি প্রাপ্য হওয়া উচিত। তোকে লাখ টাকা দিলেও তো গুনে-গেঁথে হিসেব করে চলতে পারবি না। ওই রাখোহরিই তোর মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে নেবে। তার চেয়ে এই ট্যাক্সিখানা চালা। চালাবিও ভাল, থাকবি আনন্দে, খেয়ে-পরে। খুব বেশি লোভ-টোভ করিস না বাবা।

তারপর সেই গাড়ি সাদা-হলুদ রং করে, সিট-টিট পালটে, মেরামত করে, কালীঘাটে নিয়ে মায়ের পুজোর ফুল-সিন্দুর ঠেকিয়ে লাইসেন্স পারমিটের ঝামেলা মিটিয়ে একদিন ট্যাক্সি হয়ে রাস্তায় বেরোল। মা দৃশ্য দেখে বুক চাপড়ালেন, ছেলেটাকে চাকরের অধম করেছ। এতদিন ছিল ড্রাইভার, তাও না হয় বুঝতাম। এখন কিনা ট্যাক্সিওয়ালা!

দূরদর্শী বগলাপতি কপালে ভাঁজ ফেলে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, লজ্জার কী! এখন ওর স্বাধীন ব্যাবসা। ওর যা ক্ষমতা সেই অনুযায়ি ওকে স্বাধীন করে দিলাম। এখন ও নিজেকে চালিয়ে নিতে পারবে। ভাইদের হাততোলা হয়ে থাকলে আমাদের চোখ বুজবার পর ও সত্যিই চাকর-বাকর হয়ে যেত। বাপ-মা মরলে ভাইতে আর তালুইতে তফাত কী?

মা তবু ঘ্যানঘ্যান করতে লাগলেন, তা দিলেই যদি তবে নতুন আব ভাল গাড়ি দিলে না একখানা? বিশ-ত্রিশ হাজার টাকার দামি গাড়ি হলেও না হয় বুঝতাম।

দূরদর্শী বগলাপতি আবার কপালে ভাঁজ ফেলে কী একটু ভাবেন, তারপর বলেন, সামনে বড় দুর্দিন, বুঝলে বড় বউ! সেই দুর্দিনে একখানা দামি গাড়ি যদি গৌরের কাছে থাকে তবে রাখোহরি কি ছেড়ে দেবে? সেটা একটা অ্যাসেট বলে কেড়ে নেবে হয়তো বা। তা নতুন ল্যান্ডমাস্টার একটা দিতে পারতাম বটে, কিন্তু তার জন্য বসে থাকতে হবে। এই বয়সে এখন আর আমার দেরি সইছে না। নতুন না হোক গোরাই জানে যে গাড়িখানা খুব চাল, পচা মাল দিয়ে ওকে ঠকাইনি। আমারই তো ছেলে, ওর ভবিষ্যৎ ভেবেচিন্তে ঠিক জিনিসখানাই দিয়েছি, এখন ইবলিশের বাচ্চা নিজের কপাল যদি নিজে না ভাঙে তো সংসারে চালু থাকবে।

দক্ষিণের রাস্তাগুলোই ভাল। না আছে মিছিল, না জ্যাম। পুলিশও নয় নর্থের মত টিকরমবাজ। গৌরহরি ট্যাক্সির মিটার ঢেকে এখন মালিকের মতো গাড়ি চালাচ্ছে। মিটার খুললেই টাক্সিওয়ালা। মিটার ঢাকলেই গৌরবাবু। তার ঘুমটা এখন মাথা থেকে বেরিয়ে একটা মাছির মতো চারধারে ভো ভোঁ করে ঘুরছে। সুযোগ পেলেই আবার ঢুকে পড়বে মাথায়। অমনি আবার আবছা হয়ে যাবে রাস্তাঘাট, রিয়্যালিটির সঙ্গে ড্রিম মিশে যেতে থাকবে। ঢাকার বুড়িগঙ্গার তীরের সেই কামানখানা এখনও লাল নীল হলুদ বল ছুঁড়ে দিচ্ছে বাতাসে। সেইসব বল ওড়াউড়ি করছে। ধীর গতিতে গড়াচ্ছে, ভাসছে, এসে বসছে বনেটের ওপর। মাঝে মাঝে সামনের রাস্তা উঠে যাচ্ছে উঁচুতে। এক-আধজন মানুষ চলতে চলতে হঠাৎ উড়ে যাচ্ছে কোথায়! ভুস করে। ঠিক থাকো গৌরবাবু, ঠিক থাকো। আর একটু দূরেই দাশ কেবিন। এই তো প্রায় এসে গেছি বাপধন। আর একটু, আর একটু মাথাখানা পরিষ্কার রাখো তো বগলুর ছাওয়াল।

পিছনের সিটে মচ করে একটা শব্দ হয়। পরিষ্কার শব্দ। কোনও ভুল নেই। গৌরহরি আয়নায় চোখ রাখে। ওই শালা ডেডবডিটা। বস্তুত ডেডবড়িটাকে দেখা যায় না কখনও। কিন্তু শালা আছে ঠিকই। যখনই গৌর গাড়িতে একা তখনই শালার নড়াচড়া শুরু হয়। বিনা পয়সার সোয়ারি শালা, ধরতে পারলে ঘাড় ধরে ঝাকার দিত গৌর। বগলুর ছাওয়ালের সঙ্গে চিটিংবাজি! শালা ডাকটিকিটের মতো অন্যের জিনিসে সেঁটে থাকা!

কিন্তু ওই একটা অসুবিধে। জ্যান্তদের সঙ্গে তবু ট্যাকল করা যায়, যতই আঁশটেবাজ হোক। কিন্তু মড়াগুলোকে কিছুতেই কিছু করা যায় না। এই ডেডবডিটাকে আজ পর্যন্ত কিছু করতে পারল না গৌর। শালা বগলুর ব্যাটাকে ছোলাগাছি দেখিয়ে দিব্যি ল্যান্ডমাস্টারখানা বিনিপয়সায় ভোগ করে যাচ্ছে। দেখছে কলকাতা। ফোর টুয়েন্টি কোথাকার!

বিস্তর হাত উঠছে ভিড় থেকে তার ল্যান্ডমাস্টার লক্ষ্য করে। লোকে চেঁচাচ্ছে, ট্যাক্সি, ই, ই,

মাছিটা ভোঁ ভোঁ করে উড়ছে মাথার আশেপাশে। এক্ষুনি নাক কি কানের ফুটো দিয়ে ভিতরে সেঁধিয়ে যাবে। গৌর বিড়বিড় করে, আর একটু বাবা গৌর, আর একটু। শালারা ভেবেছে ভাড়ার গাড়ি। দেখছে না শালা যে লাল কাপড়ে মিটার ঢেকেছি! এখন শালা এ গাড়ি আমার প্রাইভেট। ওই ডেডবডিটা ছাড়া আর কোনও সোয়ারি নেই। এখন আমি ফ্রি। এখন আমার টিফিন টাইম।

ফাদার ফ্রান্সিস যখন খেলা শেখাত, তার সঙ্গে শেখাত উচ্চারণও। সেন্ট অ্যান্টনিজ-এর ঘেরা মাঠে ফাদার ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে ডাকত, হে গৌরঅরি, ফ্যাস দি বল।

গৌর চেঁচিয়ে বলত, পাস দি বল।

সে ফ্যাস ফ্যাস, নট পাস।

গৌর হেসে কুটিপাটি, ফ্যাস ফ্যাস, আই ওনট ফ্যাস দি বল ফাদার, আই উড লাইক টু পাস।

দুষ্টু ছেলে গৌরঅরি, অ্যাও, বালো ওবে না।

আই! অবিকল ফাদার ফ্রান্সিস লাল নীল বলগুলোকে ঠেলে দিচ্ছেন এধার ওধার। সারা চরাচর জুড়ে ভাসছে সেই সব রঙিন গোলা। ফাদার চেঁচিয়ে বলছেন, এই গৌরঅরি, ফ্যাস ইট, ফ্যাস ইট।

আই ফাদার,-গৌরহরি বিড়বিড় করে, আই উড লাইক টু ফ্যাস ইট ফাদার। আই উড ভেরি মাচ লাইক টু

ফাদার ফ্রান্সিস চরাচর জুড়ে খেলা করেন। তার সঙ্গে খেলে স্বপ্নের শিশুরা।

উড়ন্ত মানুষেরা বল ধরে এগিয়ে দিচ্ছে ফাদারের পায়ে। গৌরের গাড়ি আবার মাটি ছেড়ে উড়তে থাকে। গৌর জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা লাল বল ধরার চেষ্টা করে। পারে না। হেসে গড়িয়ে পড়েন ফাদার, গৌরঅরি, অ্যাও গৌরঅরি, গুড ফর নাথিং!

রাসবিহারীর মোড়ে তার গাড়ি আবার মাটিতে নামে ঝং শব্দ করে। গৌরহরি চমকে ওঠে। চমকায় পিছনের সিটের সেই ডেডবডি।

গৌরের জানালায় দুটো মুখ ঝুঁকে পড়ে, হাঁফাতে হাফাতে বলে, যাবেন দাদা! আমরা বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।

দেখছেন তো মিটার ঢাকা রয়েছে।

একটু দয়া করুন।

দয়া। কীসের দয়া! কোন পুলুসটা দয়া করে বগলুর ব্যাটাকে! কোন ম্যাজিস্ট্রেট! কোন সোয়ারি কথা না শুনিয়ে ছাড়ে! অ্যাঁ! পুলুস ডেকে যখন ট্যাক্সি ধরো, তখন! না, হবে না। কে বলেছে এটা ট্যাক্সি? এটা গৌরবাবুর প্রাইভেট।

দাশ কেবিনে কি পৌঁছনো যাবে শেষ পর্যন্ত? কে জানে! রাস্তাটা যে অফুরান লাগছে গৌরহরির। এখনও মনে হচ্ছে হাজার হাজার মাইল রয়ে গেছে। মোড়ে জ্বলছে লালবাতি।

বাবা লালবাতি, গৌর যে আর পারে না, বগলুর পোলার প্রাণটা যে গেল। দাশ কেবিনের সেই চোতরাপাতার ঘন কাথটি, যার নাম কিনা চা, সেইটি সিস্টেমে না ঢাললে যে এখন ড্রিমে আর রিয়্যালিটিতে চামচে নাড়া হয়ে যাচ্ছে, আমে-দুধে মিশে যাচ্ছে বাবা!

মচ করে পিছন থেকে আবার শব্দ হয়।

চোপ!বলে ধমক মারে গৌরহরি। শালা ডেডবডিটা। বিনিপয়সার পার্মামেন্ট সোয়ারি। হাফ-ফিনিশ ফিফটি পারসেন্ট গৌর না হলে শালা তোমার দম বের করে দিত।

গ্রিন লাইট।

গৌর শ্বাস ছেড়ে গাড়ি ছাড়ে।

.

দাশ কেবিন থেকে যখন বেরোল গৌর, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল সে। শরীরের ভিতরটায় বাতাস বইছে, চাঁদ উঠেছে সেখানে, বাগান আলো করে ফুল ফুটেছে। শরীরের ভিতরে এইসব হচ্ছে এখন। গৌর মৌরি চিবোতে চিবোতে একটা খো আর একটা ভাল পায়ের ওপর একটু টেরছা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর শরীরের ভিতরকার সেই জ্যোৎস্না, সেই বাগান, সেই বাতাস অনুভব করল কিছুক্ষণ। গৌর কোনওদিনই কারও সার্ভেন্ট নয়। ওই সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার ল্যান্ডমাস্টার, মিটারে লাল কাপড় জড়ানো প্রাইভেট। গৌর যখন খুশি খুলবে কাপড়, যখন খুশি প্রাইভেটকে ভাড়াটে গাড়ি বানাবে। কোনও শালার কিছু বলার নেই। এখন দাশ কেবিনের গরম অমলেট, চা আর টোস্ট তার পেটে গিসগিস করছে। ঠিক যেন বাতাসে, চাঁদের আলোয় একখানা ফুল-ফোটা বাগান। ইচ্ছে করলে, যতক্ষণ খুশি শরীরের ভিতরকার সেই দৃশ্যটা উপভোগ করতে পারে বগলুর পোলা গৌরা, কোনও শালার কিছু বলার নেই। বাপ বগলাপতিই তাকে স্বাধীন করে দিয়ে গেছে। লোকটার ফোর-সাইট ছিল বটে।

স্টোরিং এজেন্সিটা যখন ফুলেফেঁপে একটা বিশাল আকার নিয়েছে তখনই বলতে কী রাখোহরি তার ভুল বুঝতে পারছিল। কারবারটা এত ছড়ানো তার ঠিক হয়নি। বিস্তর দৌড়ঝাপ এবং তদবির করতে হচ্ছিল। সামলাতে কষ্ট হচ্ছিল বিবিধ ফুটোফাটা। ওদিকে বড়কর্তাদের রদবদল শুরু হয়ে গেছে। পালটে গেছে মিনিস্টার। নতুন করে আবার কোমরে কাপড় বেঁধে রুই-কাতলা ধরো। যাদের চিরকাল উপেক্ষা করে এসেছে রাখোহরি, তখন তাদের জো। তারা ওঁত পেতেই ছিল। কোনও গুদামেই মাপমতো মাল থাকে না। একথা কে না জানে! রাতারাতি মাল এদিক ওদিক হয়, ওজন ম্যানেজ হয়, বড়কর্তারা পান-তামাক খেয়ে ব্যাপারটা চেপে যান। কিন্তু সেবার বড়কর্তাদের পান-তামাকের বন্দোবস্ত তখনও করে উঠতে পারেনি রাখোহরি। উত্তরবাংলার গর্দিশে আটকে গিয়েছিল। এক রাতে ইন্সপেক্টর আর দারোগা তার দুটো গুদাম দিল সিল করে! রাখোহরি প্রথমে চোখ রাঙাল, তারপর লোভ দেখাল, তারপর বসল মাথায় হাত দিয়ে। ফুডের সেক্রেটারি রিটায়ার করেছে, মিনিস্টার পেয়েছে অন্য পোর্টফোলিও। রাখোহরি করে কী?

প্রথমে বগলাপতি ব্যাপারটা জানতেও পারেননি। একা-একাই ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছে। রাখোহবি। অবশেষে বেগতিক দেখে এসে পড়ল বগলাপতির কোলে, বাবা, বাঁচাও।

বগলাপতি চুপ করে সব শুনলেন। বুঝলেন, শুধু দারোগা বা ইন্সপেক্টর নয়, অন্য ব্যবসায়িরাও আছে এই চক্রান্তে। প্রফেশনাল জেলাসি। বিলেতে ম্যানেজমেন্ট শেখা রাখোহরি মূলেই গণ্ডগোল করে বসে আছে। তবুবলাপতি শেষ চো করতে বেরোলেন। কিন্তু বৃথা। ব্যাপারটা নালি ঘায়ের মতো চাউর হয়ে গেছে তখন। পাবলিক গেছে খেপে। কাগজেও ছোট্ট করে খবর বেরিয়ে গেল। পাবলিকের দুর্ভিক্ষের খাবার নিয়ে কালোবাজার। দেশদ্রোহ, মানবতার শত্রুতা। তার ওপর রাখোহরি বোকার মতো নিজের দোষ ঢাকতে সিল করা গুদামের টিন লোক লাগিয়ে রাতারাতি ফুটো করে চুরি দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটা টিকল না। রাখোহরি আর বগলাপতি, দু'জনকেই পুলিশে ধরল। বালিগঞ্জের বাড়িটাতে তখন মা আর হাফ-ফিনিশ গৌরা।

গৌরা অতশত বোঝে না। মা সারাদিন কান্নাকাটি করে। গৌরা সকালে ল্যান্ডমাস্টার নিয়ে। বেরোয়। সারাদিন কলকাতার সোয়ারি এধার ওধার করে, রাতে টাকা আর খুচরো একগাদা নিয়ে এসে মায়ের কোচড়ে ফেলে। মা কেঁদে আকুল হয়, ও আমার গৌরা! শেষে তুই খাওয়াবি আমাকে, একথা কে ভেবেছিল বাপ আমার? তোর যে বাঁচার আশা ছিল না। টিক টিক করে টিকে আছিস এই যে আমার ভাগ্যি।

ধীরেসুস্থে মিটারের লাল কাপড়টা খোলে গৌর। অমনি তৎক্ষণাৎ একজোড়া ছেলেমেয়ে এসে গাড়ির দরজার হাতল ছুঁয়ে বলে, আমরা একটু গঙ্গার ঘাটে যাব।

গঙ্গার ঘাট। মৃদু হাসে গৌর। মন্দ কী? দাশ কেবিনের পর এখন গঙ্গার ঘাট ভালই লাগবে গৌরের।

চলুন।–বলে সে লক খুলে দেয়।

ছেলেমেয়ে দুটো কলকল করতে করতে পিছনে উঠে পড়ে।

তাদের কথার মাঝখানে মাঝখানে একটু-আধটু ফিসফিসানি শুনতে পায় গৌর। মেয়েটা বলে, লোকটার একটা হাত দেখেছ। কেমন শুকনো কাঠের মতো?

ছেলেটা বলে, একটা পা-ও তাই।

ওমা! তাই নাকি? কী করে তবে গাড়ি চালায় গো? অ্যাকসিডেন্ট করবে না তো!

দূর। গাড়ি তো অভ্যাসে চলে।

গৌর হাসে। আহা, বগলুর পোলা গৌরা, হাফ-ফিনিশ ফিফটি পারসেন্ট, ছা-রা-রা রা রা–

জামিনে খালাস পেয়ে বগলাপতি যখন বেরোলেন তখন তার চেহারা রোঁয়া-ওঠা কাকের বাচ্চা মতো। মুখের চামড়া কী এক রোগে কালো হয়ে গেছে অর্ধেক। চামড়া দুল দুল করে ঝোলে। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট লালবাতি দেখাচ্ছে। বাড়ি মর্টগেজে। ডজ গাড়িটা ছ' হাজারে বিক্রি করেছে। রাখোহরি। কেস চলতে লাগল। সে কী চলা! তার ব্রেক নেই, ইঞ্জিন গরম হয় না, ড্রাইভার টিফিন খায় না। সে চলে তো চলেই। সেই কেই আস্তে আস্তে শুষে নিল তাদের সংসার। বগলাপতি ঘন ঘন দুটো স্ট্রোক সামলালেন। তৃতীয় স্ট্রোকে হড়কে গেলেন দুনিয়া থেকে। তার দুমাস পর মা। তখন বিলেত-ফেরত ম্যানেজমেন্ট শেখা রাখোহরি লুঙ্গি পরে রকে বসে বিড়ি খায়। বিলেত থেকে ফিরে অনেক কান্ড করার পর বিয়ে করেছিল। গুষ্টি বেড়েছে। মাঝেমধ্যে গৌরের ল্যান্ডমাস্টারটার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করে, এটার যেন কত দাম পড়েছিল রে?

গৌরহরি সতর্ক হয়ে বলত, হাজার চারেক বোধহয়। এখন দু'হাজারেও বিকোবে না।

বিক্রি করতে করতে অস্থাবর সবকিছুই ফিনিশ করেছিল রাখোহরি। এক কথা ছাড়া তার আর কিছুই ছিল না। মাঝে মাঝেই ধার বলে পয়সা নিত গৌরের কাছ থেকে। বিনিপয়সায় তার ট্যাক্সিতে এধার ওধার যেত। বাপের যা ছিল তার এক পয়সাও হেঁয়াল না গৌরকে। দূরদর্শী বগলাপতি তা জানতেন। ল্যান্ডমাস্টারখানা নিয়ে গৌর তাই সুখেই আছে।

তা গৌরা তেমন চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না কোনওদিনই। করলেই মলপরা দুটি পা মাথার মধ্যে চক্কর মারতে থাকে। সে এমন চক্কর যে গৌর ছোটাছুটি করে, শব্দ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, গায়ে ঘাম দেয়, চোখ-মুখ ফেটে পড়তে থাকে। কিন্তু সেই নাচুনে মাগির নাচ আর শেষই হতে চায় না। শেষে সেই ঝমঝম মাথা থেকে তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। তার রক্ত, হাড়, মজ্জা সব সেই ঝমঝমের সঙ্গে তাল দেয়। বড় নেতিয়ে পড়ে গৌরহরি। তার বাহ্যজ্ঞান প্রায় লোপ পেয়ে যায়। বগলাপতি দুনিয়া থেকে হড়কে গেলে তার স্থাবর-অস্থাবর সব যা ছিল, কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিল রাখোহরি। রিফিউজি কলোনির বাড়িতে উঠে গিয়ে বালিগঞ্জের বাড়িতে ভাড়াটে বসাল। কেবল ছুঁল না কম দামের ল্যান্ডমাস্টারটা তার আর একটা কারণ বোধহয় এই যে গৌরহরির আয় থেকে সে

নিয়মিত ভাগ বসাতে পারত। এই সব যে করল রাখোহরি, তার এত যে কায়দা কৌশল, এই সব গৌরহরি বুঝতে পারত, কিন্তু বেশি বুঝতে গেলেই মাথার মধ্যে নানা জটিল চিন্তা দেখা দিত। আর তার সঙ্গে ওই নাচুনে মাগির বেহদ্দ নাচ। তাই চিন্তাভাবনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে গৌর। কেবল মাঝে মাঝে ভাবে, আমি শালা গৌরহরি বগলাপতির ছাওয়াল, এই দুনিয়ায় আমি কি খুব ঠকে গেলুম! এই যে রুখে শুখো দুটো হাত-পা, মগজে এই যে এত ঝমঝম, এই সব নিয়ে আমি কতদুর কী করছি দুনিয়ায়? কী করার ছিল আমাব? আর কী-ই বা করেছি? তবে কি আমার সারাজীবনের একমাত্র কাজ একখানা পুরনো ল্যান্ডমাস্টারে সারা কলকাতা চষে এধারকার মানুষ ওধারে নেওয়া। এই করতে করতেই কি শালা কোনও মানুষ পারফেকশানে পৌঁছাতে পারে! অ্যাঁ? বগলুর পোলার কপালে শেষে কি এইটুকু মাত্র পারফেকশনি লেখা ছিল? বিলেত না, বিদেশ না, পয়সাকড়ি না, বউ না, না ছেলেপুলে, কেবল একটা ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টার, আর দাশ কেবিনের চোতরাপাতার কাথ, আর শালা পুলুসবাবা, লাল নীল আলো, ঝুটঝামেলা, গঙ্গার ঘাট থেকে পগেয়াপট্টি, টেরিটিবাজার থেকে সাউথ সিথি, আর মাঝে মাঝে মৌতাতের সময় বয়ে গেলে ড্রিম আর রিয়্যালিটির অ্যাডমিকশ্চার!

একটা বাজে মেয়েমানুষ আছে চৌরঙ্গির। তাকে জুটিয়েছিল আর এক ট্যাক্সিওয়ালা মদনা। মদনাই ধরে দিয়েছিল তাকে মেয়েমানুষটা। সেই মেয়েমানুষটারও সোয়ারি আছে। সোয়ারি জুটলে গৌরের ট্যাক্সি ডাকায়। ডাকিয়ে চক্কর দেওয়ায় ময়দানে। একটু অন্ধকার মতো হয়ে এলে গঙ্গার ঘাটে নির্জনে কোথাও গাড়ি দাড় করাতে বলে। গৌরহরি তখন নেমে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়, আর দেখে দূব থেকে, তার গাড়ির পিছনের কাচে দুটো ছায়া পরস্পর লেপ্টে গেল। তারপর আর তাদের দেখা যায় না। গৌরহরি চোখ ফিরিয়ে নেয় লজ্জায়। ঘণ্টাখানেকের এইসব ব্যাপারের জন্য ত্রিশ-চল্লিশ টাকা আয় হয় তার। আর সেই সঙ্গে কখনও সেই মেয়েমানুষটার শরীর একটু-আধটু ঘেঁয়া যায়। সেটুকু ভাল লাগে না গৌরের। কেবল বরক্ত বেরিয়ে যাওয়ার পর একটা রিমঝিমে ক্লান্তি আর ঘুম আসে। জীবন থেকে সে মাত্র এইটুকু পাচ্ছে, এইটুকু পারফেকশান। তার বাপের

কিনে দেওয়া ল্যান্ডমাস্টারে এইসব পাপের কাজ হয় বলে মাঝে মাঝে মরমে মরে থাকে। গৌবহরি। তার আর উন্নতি হয় না। সে যা ছিল তাই রয়ে গেছে।

রাখোহরির সংসার বিস্তর টেনেছিল গৌর। এক এক সময়ে মাসের পর মাস। কেস চলছিল। তিনটে কেস। কপাল ভালই রাখোহরির। একের পর এক কেস জিতে গেল। কী করে জিতল, কোন লিখুঁজির পথে, কে জানে! তবে জিতল ঠিকই। ফিরে গেল বালিগঞ্জের বাড়িতে। আবার গাড়ি কিনল। দাবড়ে শুরু করল বাবা বগলাপতির ব্যাবসা। রিফিউজি কলোনির বাড়িটাতেই রয়ে গেল গৌর। তার আর উন্নতি হল না। রাখোহরি বগলাপতির কথার মতোই এখন তার তালুই।

বিচিত্র গাড্ডা। এ নিয়ে যে সে ভাববে তারও উপায় নেই। কোনও সুন্দর সকালে সে রাখোহরির কাছ থেকে বাবা বগলাপতির কিছু বিষয়-সম্পত্তি ঝেকে আনবে এমনটা সে ভাবতেই পারে না। লড়াকু ছেলে রাখোহরি। বিপরীত ভাগ্যকে নিজের কোলে টেনে এনেছে আবার। মদনা গৌরকে পরামর্শ দিয়েছিল, মামলা কর।

আই বাপ! বাপের দেওয়া ল্যান্ডমাস্টারখানা আর রিফিউজি কলোনির দুখানা টিনের ঘর ছাড়া তার কিছুই নেই। মামলার খুরে খুরে তাও চলে যাবে। তার ওপর রাখোহরির মতো লড়াকু।

গাড়িটা চমকাচ্ছে। ইঞ্জিন টানছে না তেমন। গৌর বিড়বিড় করে গাল দেয়, শালা, তুই কি হিউম্যান বিয়িং যে চমকাচ্ছিস! আর একটু চল বাবা, গঙ্গার হাওয়া খাওয়াব।

গাড়ির ভিতরের অন্ধকারে পিছনের সিটে ছেলেটা আর মেয়েটা বসে আছে। পিছনের আবছা কাচে তাদের ছায়া দুটোকে দেখা যায়, লেপ্টে আছে। একটু আগেও কলকলাচ্ছিল। এখন চুপ, চুমকুড়ি কাটছে বোধহয়। আঠা দেখ শালার। কাটে কাটুক। তাতে গৌরের কী! গৌর হাত বাড়িয়ে আয়নাটা ঘুরিয়ে দেয় একটু।

রেসকোর্সের গা ঘেঁষে চমৎকার একখানা বাঁকে গাড়িখানা উড়ে যাচ্ছে। গঙ্গার বাতাস ঝাপটা মারে। নিয়োনের আলোয় তারার গুঁড়ো ঝরে পড়ছে। ওই দেখা যায় জাহাজের হলুদ মাস্তুল, জিরাফের মতো উঁচু গলার ক্রেন। আলোয় আলো বন্দর। চওড়া রাস্তায় ধুলোর কণা মেলে না প্রায়। যতবার এই ঘাটে এসেছে গৌর ততবার মনে হয়েছে, এই তো বিদেশ! এই তো শালার লন্ডন, যেখানে একদা ল্যাস্ত করেছিল তার দুই দাদা, রাখোহরি আর থাকোহরি। গৌরও করত। স্বভাবের নিয়মে সব চললে আজ তারও হয়তো মেম বউ। বেগড়বাই বাধালো মগজের ওই ঝমঝম শব্দ, আর দুটো রুখখা-শুখো হাত-পা।

ভাবতে ভাবতে শাস টানে গৌর। গঙ্গার বাতাসে তার ফুসফুস পালের মতো ফুলে ওঠে। কলকাতা পার হয়ে লন্ডনের ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করায় গৌর।

ওমা! এসে গেছি! মেয়েটা চমকে গিয়ে বলে।

আড়চোখে আয়নাটা দেখে গৌর। ছায়া দুটো আবার আলগা দিয়েছে। শালা ভুখখা পার্টি। ঘরদোরে জায়গা পায় না, তাই ট্যাক্সিতে চড়ে যত আশনাই। গৌরবাবুর ল্যান্ডমাস্টারখানাকে কী পেয়েছিস তোরা? ফুলশয্যার বিহানা, না হানিমুন কটেজ?

ছেলেটা নেমে মিটার দেখল না, জিজ্ঞেস করল, কত?

গৌরও মিটার দেখল না, কেবল একটু আলস্যের সঙ্গে বলল, চার টাকা দশ পয়সা।

ছেলেটা ভ্রুক্ষেপও করল না। দিয়ে দিল। তারপর ছেলেটা আর মেয়েটা গঙ্গার ঝোড়ো বাতাসে এলোমেলো চুল হাতে সামলাতে সামলাতে আলো থেকে অন্ধকারে কোথায় চলে গেল।

গৌর নেমে মিটার ঘুরিয়ে দেয়। সত্যিকারের কত উঠেছিল তা দেখার চেষ্টাও করে না। সঙ্গে মেয়েছেলে থাকলে উঁটিয়াল ছেলেরা মিটার-ফিটার দেখার ঝামেলা করে না।

গৌরেরই বা কী দায় পড়েছে! সেও আন্দাজি মারে। বগলুর পোলা গৌরা, প্রেস্টিজে সে কম যায় কীসে?

বনেটটা খুলে দেয় গৌর। খা বাবা ল্যান্ডমাস্টার, গঙ্গার হাওয়া খেয়ে নে। মিটারটা আবার লাল শালুতে ঢাকে গৌর।

তারপর বগলুর ব্যাটা গৌর গাড়ির গায়ে বসে পেচ্ছাব করে, থুতু ফেলে। তারপর নির্জন ঘাটের কংক্রিটের রেলিং ধরে এসে দাঁড়ায়। সামনেই হলুদ একখানা জাহাজ। তার সর্বত্র উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। উঁচু মাস্তুল পর্যন্ত উজ্জ্বল আলোয় ধুধু করছে। জাহাজের বিশাল খোল দেখে গৌর, দেখে তার সাদা কেবিন, আর শুনশান ডেক। কোনওখানে কোনও মানুষ নেই। এমন নির্জন আলোকিত জাহাজ কখনও দেখেনি গৌর। সে হা করে দেখে আর দেখে। জাহাজটা খুব ধীর লয়ে দোলে। কোন কোন মুলুকে চলে যাও হে জাহাজবাবা! বগলুর ছাওয়াল পড়ে আছে কোন গাড়ায়! ফিফটি পারসেন্ট বলে গৌরার সব ফুর্তিই বিলা হয়ে গেল। নইলে বাবা জাহাজ, তোমার ওই ডেকের রেলিং ধরে ঝুকে আমি সমুদ্র দেখতুম। অ্যালবাট্রসের ছায়া দেখতুম, আমার টাই ফুরফুর করে উড়ত হাওয়ায়। জাহাজবাবা, হাফ-ফিনিশ গৌরার লাইফটায় কী আছে বলো তো! ওই ভূতুড়ে ল্যান্ডমাস্টার, দুটো রুখে-শুখো হাত-পা, মগজে এক বেহদ্দ নাচুনে মাগির ঝমাঝম। কলকাতার সওয়ারি এধার ওধার করে কেটে যাচ্ছে জীবন। বাবা জাহাজ, সাত ঘাটের জল খাও তুমি। সমুদ্রের জলে তোমার ছায়া পড়ে, সেই ছায়ায় খেলা করে স্বপ্নের পৃথিবী। নোনা হাওয়ায় কোন কোন মুলুকের গন্ধ ভেসে আসে। আর গৌরা!

মার শালা ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টারের মুখে তিন লাথি, নি লাথি কলকাতার সোয়ারিদের, আর তিন লাথি লাগা গৌরার কপালটায়। ফিফটি পারসেন্ট হাফ-ফিনিশ গৌরা এইসব ভাবে, আর বিভোর হয়ে দেখে হলুদ জাহাজখানা।

ল্যান্ডমাস্টারটা হাঁ করে হাওয়া খাচ্ছে, গাঁই গাঁই করে ডেক-এ বাতাস বইছে ঝড়ের মতে। গৌরার লম্বা চুল ওড়ে। বিদেশি বাতাসে ভরে ওঠে বুক। গৌরার ফিরতে ইচ্ছে করে না,

জাহাজখানা দেখতে দেখতে গৌর এক অদ্ভুত ওয়্যারলেস শুনতে পায়। বাতাসের ডাকের মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা ভাষা ভেসে আসে। জাহাজটা গৌরকে কী যেন বলে। আই। জাহাজখানা হাফ-ফিনিশ গৌরাকে ওয়্যারলেসে ডাকে, বলে, বুয়েনস এয়ারিসের মতো সুন্দর শহর বড় একটা নেই। আমি সেখান থেকে এলুম। যাচ্ছি টোকিও, ফিরব লন্ডনে, যতদিন চালু আছি ততদিনই জীবনটা সুন্দর। জল আর স্থলের জীবন দুরকম বাবা গৌর। যেমনই হোক, চালু থাকাটাই আসল কথা। জলে, স্থলে বা অন্তরীক্ষে চালু থেকে। হে বগলাপতির ব্যাটা, বগলুর ছাওয়াল। সংসারে চালু থাকাটাই সাকসেস।

অবিকল এইরকম কথা বলতেন বগলাপতিও। ইবলিশেব বাচ্চা যদি নিজের কপাল না ভাঙে তবে এই ল্যান্ডমাস্টারটার জোরেই সংসারে চালু থাকবে। বগলুব ফোর-সাইট ছিল বটে। আজও যে সংসারে চালু আছে গৌর তা ওই ল্যান্ডমাস্টারটার জোরেই। ওই যে শালা হা করে গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছে ওই ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টারটার জোরেই। ওই যে শালা হাঁ করে গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছে ওই ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টার, মগন সিং-এর গ্যারাজ থেকে যেটাকে ন' হাজারে কিনেছিলেন বগলাপতি। সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি বলে রাখোহরি ছোয়নি ওটাকে। গৌর চালু আছে ল্যান্ডমাস্টারটার জোরে, তবু কখনও-সখনও গঙ্গার ঘাটে এলে নীল সাদা হলুদ জাহাজগুলো অনেকক্ষণ দেখে গৌর। তখন তার ইচ্ছে করে ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টারটাকে তিন লাথি, তিন লাথি কলকাতা আর কলকাতার সোয়ারিদের আর তিন লাথি নিজের কপালটায় মারতে।

জাহাজবাবা, আমার বাবা বগলও বলত এরকম কথা তোমার মতো। সংসারে চালু থাকাটাই আসল কথা। তবু মাঝে মাঝে জাহাজ কি উড়োজাহাজ দেখলে, কিংবা হাওড়া কি শেয়ালদা থেকে দুরের রেলগাড়ি ছাড়ার সময়ে হঠাৎ বুকে বড়শি বিধে যায়। কোন অচেনা দূর যেন আমায় কলকাতার ঘোলা জল থেকে টেনে তুলে নিয়ে যেতে চায় জাহাজবাবা। আমি তো জানি, আমি হচ্ছি গে ঢাকার টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটা, হাফ-ফিনিশ ফিফটি পারসেন্ট গৌরা, খুব বেশিদূর যাওয়া আমার নেই। কলকাতাই আমার লিমিট। ঘুরে ঘুরে সেই কলকাতা, ঘুরে ঘুরে ফের কলকাতা। বাবা হলদে জাহাজ, আমি

যখন মুরগিহাটার সোয়ারি বাগবাজারে খালাস করি, তখন তুমি বুয়েনস এয়ারিস ছেড়ে চলেছ টোকিও, কিংবা ফিরতি পথে লন্ডনে। নীল পাহাড়ের ওপর বাতিঘরের আলো দেখো তুমি, দেখো সমুদ্রের ঝড়। ইটালির জলপাইয়ের বনের ঝড় এসে লাগে তোমার মালে। বাবা জাহাজ, বুকের বড়শিটা মাঝে মাঝে জোর টান মারে। কলকাতার ঘোলা জলে গৌর চমকায়, ঠিক যেমন ইঞ্জিন গরম হলে মাঝে মাঝে চমকায় তার ল্যান্ডমাস্টার। হাফ-ফিনিশ বলে গৌরা যে কোনও কিছুই পায়নি জাহাজবাবা!

খুব জোর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে গৌর, সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দে সে নিজেই চমকে ওঠে। আই! বগলুর দুই ব্যাটা বিস্তর জাহাজ দেখেছিল, দেখেছিল সমুদ্র, বিদেশ, দেখেছিল বিস্তর মেয়েছেলে। কিন্তু বগলুর তিন নম্বর ব্যাটা আটকে গেছে এক ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টারের বগলতলায়। ছাড় নেই। তাই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গৌর আবার ল্যান্ডমাস্টারের কাছে ফিরে আসতে থাকে।

মিটারের লাল শালুটা অন্যমনস্কভাবে খোলে গৌর, বনেট বন্ধ করে। ড্রাইভিং সিটে বসে চাবিটা বের করে, তারপর হঠাৎ আগাপাশতলা চমকে উঠে বুঝতে পারে, তার পিছনের সিটে কে যেন বসে আছে। আয়নায় দেখা যায় পিছনের কাচের গায়ে একটা মাথা একটু হেলে আছে। এলানো একটা শরীরের ছায়া দেখা যায়। দরজাটা ঠেলে এক লাফে বেরিয়ে আসে গৌর। শালা ডেডবডিটা!

কয়েক পা নেংচে নেংচে দৌড়ে যায় গৌরহরি। তারপর থামে। একটু দুরে দাঁড়িয়ে নিজের ল্যান্ডমাস্টারটার দিকে হা করে চেয়ে থাকে। বাস্তবিক ল্যান্ডমাস্টারটা কোনওদিনই সেন্ট পারসেন্ট গৌরহরির না। ওর ফিফটি পারসেন্ট ওই শালা ডেডবডিটার, এটা গৌর মাঝে মাঝে টের পেত। এখন ডেডবডিটার আবছা অবয়ব দেখে গৌরহরি বুঝতে পারে, শালা ভূতেরাও দাবি-দাওয়া ছাড়ে না। কবে মরে-হেজে গেছিস, তবু একটা পুরনো ল্যান্ডমাস্টারের মায়া কাটাতে পারলি না, বাবা ডেডবডি! মানুষের কত কিছু চলে যায়। আমার বাপ বগল সাতটা জাহাজডুবির শোক পেয়েছিল। আর আমি সেই বগলুর তিন লম্বর ব্যাটা, দ্যাখ এই হাফ-ফিনিশ আমার জীবনটা, টিকাটুলির ডাকসাইটে বগলাপতির

ছাওয়াল আমি, তবু আমার কপালে কেবল অবশিষ্ট আছে ওই ল্যান্ডমাস্টারটা, যার ফিফটি পারসেন্ট ভূতের কবজায়। বাবা ডেডবডি, গৌর কি কখনও ইন্টারফিয়ার করেছে তোমাদের ব্যাপারে? তবে তুমি কেন বাবা, হাফ-ফিনিশ গৌরার ল্যান্ডমাস্টারে? ল্যান্ডমাস্টারটা ছাড়া গৌরের যে আর কিছুই নেই বাবা!

গৌর দুরে দাঁড়িয়ে তার ল্যান্ডমাস্টারটার দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকে, আর বিড়বিড় করে। তারপর চমকায়।

গাড়ির পিছনের জানালা দিয়ে আস্তে আস্তে একটা মাথা বেরিয়ে আসে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে। তারপর হঠাৎ গৌরকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলে, হেই! কাম হিয়া

অমনি গৌরের মাথার ধোঁয়া কেটে যায়। গাড়ির দরজা লক করা ছিল না। মাতালের পো উঠে বসে আছে। ভারী রেগে যায় গৌরহরি। নেংচে নেংচে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা হ্যাচকা টানে খুলে ফেলে সেন্ট অ্যান্টনিজের পাকা ইংরিজিতে বলে, এখানে কী হচ্ছে! অ্যাঁ? বেরোও, বেরিয়ে যাও!

লোকটা তবু দিব্যি গা ছেড়ে বসে থাকে, মাথাটা পিছনে হেলাননা। ডান হাতখানা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে নেড়ে গৌরের ধমক-ধামক উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বলে, টেক মি টু স্যু।

স ফু আমি জানি না। তুমি বেরিয়ে এসো।

মাতাল লোকটা তবু হাত নেড়ে বলে—দেন টেক মি টু এ গুড উম্যান মেট।

বগলাপতির ছাওয়াল কি মেয়েছেলের দালাল? ইজ হি?-চোস্ত ইংরিজিতে গৌর বলে, মাতাল আর মেয়েছেলেদের আমি ঘেন্না করি। তুমি কেটে পড়ো।

গৌরের ইংরিজি শুনেই বোধহয় লোকটা একটু থমকে যায়। ইতস্তত করতে থাকে। গৌর লক্ষ করে, লোকটা বেঁটে-খাটো, বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মতো বয়স। জুলপিতে পাক ধরে একগোছা চুল সাদা হয়ে আছে। গায়ের রং রোদে জলে খেয়ে গেছে বলে বোঝা যায় না কোন দিশি। তবে জাহাজি বলেই মনে হয়। বাতাস যদিও ওড়াচ্ছে সবকিছু, তবু গৌর একঝলক মদের গন্ধ পায়। মাতালদের গাড়িতে তোলে না গৌর। শালাদের কখনও কোনও স্থির ডেস্টিনেশন থাকে না। তার ওপর মাঝে মাঝেই শরীরের কাথ হড়হড় করে ঢেলে দেয় গাড়িতে। বোয়ামোছা করতে গৌরের দম বেরোয়।

নামবে কি না বাপু, না কি পুলিশ ডাকব? গৌর ইংরিজিতে বলে।

গৌরের সেন্ট অ্যান্টনিজের নির্ভুল ইংরিজি শুনে লোকটা সত্যি ভড়কে যায়। নামবে কি না ইতস্তত করে, ঠোঁট চাটে, চুলে হাত বোলায়, উদভ্রান্ত চোখে চারদিকে চায়।

উত্তেজনার মধ্যেও লোকটার হাবভাব দেখে গৌর তৃপ্তি পায়। আই জাহাজির পো, শুনে লে ইংরিজি কাকে বলে! বগলাপতির এক ব্যাটা বিলেতে রয়ে গেছে, আর এক ব্যাটা বিলেত ফেরত, তিন নম্বর যদিও হাফ-ফিনিশ তবু ইংরিজি শিখেছিল ফাদার ফ্রান্সিসের কাছে। শুনে লে বাবা জাহাজি।

লোকটা অসহায়ের মতো বিড়বিড় করে বলে, আমাকে সুর কাছে যেতেই হবে। আমাকে পোঁছে দাও। দয়া করো।

বলতে বলতে লোকটা একটু কাত হয়ে হিপ পকেট থেকে একগোছা দশ টাকার নোট বের করে গৌরকে দেখায়, বলে, আমার টাকা আছে, চিন্তা নেই। একটু আগে আমি একটা ঘড়ি বিক্রি করেছি, আর একটা স্পাই ক্যামেরা। এই দেখো কত টাকা।

টাকা দেখাচ্ছে। টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরি, যে কিনা ডজ গাড়িটার আয়না দিয়ে বিস্তর রাজার মাথা আর তিন সিংহের মূর্তির ছবি দেখেছে, তাকে কি দেখাচ্ছে ফুটো

পকেটের জাহাজি! ভারী রেগে যায় সে। ভাল হাতখানা বাড়িয়ে সে জাহাজিটার হাত ধরে টান মারে, চেঁচিয়ে বলে, নামমা, নামো, টাকা আমি বিস্তর দেখেছি।

গৌর টানে। লোকটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে ভিতরে সেঁধোতে থাকে। পা দু'খানা সিটের ওপর তুলে গোঁজ হয়ে পুঁটলি পাকিয়ে বসে, বলে, দয়া কবো!

অসুবিধে এই যে গৌরের একটা হাত আর একটা পা কমজোরি। আর লোকটা সেন্ট পারসেন্ট হাত-পাওলা, গৌর সুবিধে করতে পারে না। যত টানে, তত লোকটা সিট আঁকড়ে শুয়ে পড়তে থাকে। গৌর রেগে বাংলায় বলে, ফোট শালা বেজন্মা। আজ তোরই একদিন কি আমারই!

শুনে, শুয়ে থেকেই জাহাজিটা বড় বড় চোখ করে চায়। বলে, আরে বাঃ, তুমি বাঙালি দেখছি!

লোকটাকে গৌর সাহেব ভেবেছিল অনেকক্ষণ ধরে। এখন তার মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে চমকাল খুব। হা করে একটু চেয়ে থেকে বলল, তুমি সাহেব নও?

লোকটা সিট আঁকড়ে আধাশোয়া অবস্থাতেই বলে, আরে দূর! আমি তোমাকেই সাহেব ভেবেছিলাম। যা ইংরিজি বলছিলে! মাইরি, শিখলে কোথেকে অমন ইংরিজি?

গৌর একটু দম নিয়ে বলে, সেন্ট অ্যান্টনিজ, ঢাকা। তুমি কোথেকে শিখেছ?

লোকটা যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, এমনভাবে সহজ ভঙ্গিতে উঠে বসে, হাত-টাত ঝেড়ে বলে, আমি শিখেছি জাহাজে, সাত ঘাটের জল খেয়ে।

গঙ্গার বাতাসে গৌরের রাগ উড়ে গেল। বাঙালির মুখে ভাল ইংরিজি শুনলে গৌরের এরকম হয়। তবু সে বলে, আমার গাড়িটা মাতালদের জায়গা না।

লোকটা ভয়ে ভয়ে মিটমিট করে তাকায়, বলে, আমি শুধু একটু বিয়ার খেয়েছি। মুখ শুকে দেখো। হাই!

লোকটা হাঁ করে এগিয়ে আসে। গৌর পিছোয়। পিছিয়ে নিরাপদ দুরত্বে সঁড়িয়ে বলে, তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। গাড়ি খুলে আমি দেখি একটা ভূত বসে আছে।

লোকটা হাসে। একটা সোনালি দাত চিকমিক করে। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলে, আজ বিকেল থেকেই আমার মনটা খুব খারাপ, বুঝলে! খুব খারাপ।

মাতালদের দুঃখের কথা সহজে শেষ হয় না। গৌর জানে। তাই সে একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, বুঝেছি। এখন গাড়িটা ছাড়ো, আমার কাজ আছে।

লোকটা আতঙ্কিতভাবে দরজার হাতলটা আঁকড়ে ধরে ভয়ের চোখে গৌরের দিকে চায়।

তাকে ভয় পায় এমন লোক বড় একটা দেখেনি গৌর। বরং সারাটা দিন গৌরই বিস্তর লোককে ভয় পায়। কখন কোন পুলুসবাবা ধরে, কোন সোয়ারি কোন গাড়ায় নিয়ে ফেলে, কখন ল্যান্ডমাস্টারের ভূতটা শব্দ করে ওঠে। সারা দিনটা ভয়ে ভয়েই কাটে গৌরের, তাই এখন একজন তাকে ভয় পাচ্ছে দেখে গৌরের একটু মায়া হয়। সে নরম গলায় বলে, তোমার মতলবখানা কী?

লোকটা মিনতি করে, আমাকে নামিয়ে দিয়ো না। সুর কাছে পৌঁছে দাও। আমি বড় দুঃখী লোক, বুঝলে, সারা সন্ধে একটাও ট্যাক্সি আমাকে নেয়নি।

বলতে বলতে লোকটা হেঁচকি তোলে। কাত হয়ে হিপ পকেট থেকে এক প্যাকেট রথম্যান সিগারেট বের করে গৌরের দিকে বাড়িয়ে দেয়, এই নাও সিগারেট।

গৌর মাথা নাড়ে, না।

লোকটা মিনতি করে, নাও মেট। খুব ভাল সিগারেট। পুরো প্যাকেটটাই তুমি নিয়ে নাও।

গৌরা মাথা নাড়ে, না।

লোকটা করুণ চোখে চেয়ে বলে, আমার জাহাজের জাহাজিরা সব যে যার মেয়েমানুষের কাছে চলে গেছে, ফুর্তি লুটছে সবাই। আর আমি শেষ জাহাজিটা সারা সন্ধেবেলা চেষ্টা করছি, কোথাও যেতে পারছি না। মাইরি!

জাহাজিটা ওয়ার্নিং না দিয়ে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে। টপটপ করে চোখের জল পড়তে থাকে।

গঙ্গার এই হুড় বাতাসটাই খারাপ। গৌরের মনটাকে দুবলা বানিয়ে দিয়েছে। সে যথেষ্ট বদমেজাজি হওয়ার চেষ্টা করেও পারছে না। তার ওপর লোকটা কাঁদতে শুরু করতেই সে কেমন কেবলে যায়। মায়েদের মতো ষাট ষাট' করতে ইচ্ছে করে।

তা না করে গৌর লোকটার সিগারেট নেয়।

বলে, স্যু কে?

লোকটা নীরবে খানিকটা চোখের জল মোক্ষণ করে রুমালে চোখ মোছে। একটু চুপ করে থেকে আবার দাত দেখায়। সোনালি সঁোতটা চিকমিক করে। সযত্নে সে একটা দামি গ্যাসলাইটার বের করে গঙ্গার বাতাস থেকে নিপুণ হাতের তেলোয় আড়াল করে আগুন জ্বালে। গৌরের সিগারেট ধরিয়ে দেয়, নিজে ধরায়। অন্ধকারে ভিতরে সরে গিয়ে গৌরের জন্য জায়গা করে দিয়ে বলে, বোসো।

বনেটটা আবার খুলে দেয় গৌর। গঙ্গার হাওয়া খেয়ে লে বাবা ল্যান্ডু। লাল শালুতে আবার মিটারখানা ঢাকা দেয় সে। এসে পিছনের সিটে বসে দরজাটা খোলা রেখে, গঙ্গার হুড় বাতাস বিদেশের গন্ধ উড়িয়ে আনে। তছনছ করে দিয়ে যায় মানুষের মন।

লোকটা নরম গলায় বলে, দেশের মাটিতে যখন জাহাজ ভেড়ে তখন জাহাজিরা নামে লাফ দিয়ে, তারপর দৌড় লাগায়। আত্মীয়স্বজনকে আঁকড়ে ধরে, হাগিং কিসিং, কত

আদর ভালবাসার কথা হয় না? বুঝলে, ওরকম হত, কলকাতায় জাহাজ ভিড়লে। বাচ্চাবেলায় পালিয়ে গিয়ে জাহাজে চাকরি নিই। মা কান্নাকাটি করত, বাপ দুশ্চিন্তা করত, আমারও জাহাজে সময় কাটত না। কলকাতা-মুখো জাহাজ মুখ ফেরালে দুনিয়ার রং পালটে যেত। মা বাপ ছোট্ট ভাইটার জন্য। আনতাম রাজ্যের জিনিস, কত আদব হত আমার, কলকাতায় কয়েকটা দিন উড়ে যেত ফুয়ে। তারপর বুড়ো হয়ে বাপ মরল, মা মরল। দু'বার দুনিয়া চক্কর দিয়ে এসে দুটো সংবাদ পেয়ে মন ভেঙে গেল খুব। কলকাতার ওপর টান কমতে থাকল। ছোট ভাইটা ছিল, তার কাছে আসতাম। কিন্তু সে ব্যাটা বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে হল প্রফেসর, আর আমি লেখাপড়া শিখিনি, জাহাজের খালাসি। আমাকে ব্যাটা ভাল চোখে দেখত না। তাছাড়া বাপের কয়েক কাঠা জমি-বাড়ি সে ভোগদখল করছে। আমি এলে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখত। তার বউ বাচ্চা পর্যন্ত আমাকে পছন্দ করে না। এটা বুঝবার পরই হঠাৎ একদিন কলকাতার ওপর আমার টানটা ঝড়াৎ করে ছিড়ে গেল, জাহাজের টানে যেমন জেটির মোটা কাছি ছিড়ে যায়। তখন কলকাতা-মুখো জাহাজ চললেও মনে হত বিদেশেই যাচ্ছি, যেমন লন্ডন বা টোকিওয় যাই। তা এই রকম যখন অবস্থা তখন একদিন চলন্ত জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, আরে, আমার যে কোনও পিছুটান নেই! আমি যে কেবল যাই, কোথাও ফিরি না! অন্য জাহাজিরা দুনিয়ার সর্বত্র যায়, আবার দেশে ফেরে। আমার দেশ নেই বলে যে ফেরাও নেই! ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল, বুঝলে! ছেলেবেলা থেকেই আমার ভাবনা-চিন্তার অভ্যাস নেই। বেশি চিন্তা করলে আমার মাথায় ঝইঝাই শব্দ হত, ওই শব্দের জন্যই আমার পড়াশুনো হয়নি।

গৌর চমকে জিজ্ঞেস করে, কেমন শব্দ বললে?

ঝাঁইঝাঁই। অনেকটা বড় কত্তালের মতো।

গৌর শ্বাস ছাড়ে। বলে, আমার হত ঝমঝম। অনেকটা নূপুরের মতো।

আই।- লোকটা বলে, তা চিন্তা-ভাবনা করতে করতে যখন মাথা ঝাইফাই করতে শুরু করল তখন আর এক জাহাজি পরামর্শ দিল, বিয়ে করো। ঘরসংসার হলে তোমার ফেরার জায়গা হবে। তা আমি বিয়ে করলাম, সানফ্রান্সিসকোতে। আমার বউ বেশ সুন্দরীই ছিল, খুব আদুরে। তার আর আমার টাকা-পয়সা যোগ করে আমরা তিন-চার মাসের লম্বা হানিমুন কাটালাম আমেরিকার নানা। জায়গায়। সে কী ফুর্তি! কিন্তু সুখের দিন যায়। সেবার হানিমুনের শেষে অস্ট্রেলিয়া হয়ে জাপান যেতে হল, লম্বা টুর। ফিরতে ফিরতে বছর গেল ঘুরে। শেষে ক'মাস বউয়ের চিঠি পাইনি। জাহাজ আমেরিকা-মুখখা হতেই আমার মন আনন্দে হাততালি দিল, এতদিন বাদে আমি ফিরছি। আমার ফেরা আছে। জাহাজ ডাঙার দিকে এগোয় আর আমি উৎকণ্ঠায় সাত-আট ফুট লম্বা হয়ে তীর দেখার চেষ্টা করি। অবশেষে পৌঁছে দেখলাম, বউ জাহাজঘাটায় আসেনি। খানিক দূরে এক ছোট্ট টিলার নীচে আমাদের বাসা ছিল, সেখানে গিয়ে দেখি, বাসায় অন্য লোক। বাড়িওলা বুড়ো অনেক কষ্টে চিনতে পেরে বলল, খুবই দুঃখের কথা, সে মেয়েটি তো আবার বিয়ে করে নিউইয়র্ক চলে গেছে। বুঝলাম, বউ ভেগেছে। সেই দুঃখে জমি নিলাম। কিন্তু ভেবে দেখলে তার দোষ দেওয়া যায়না । মেমসাহেবরা বেশিদিন একা একা থাকতে পারে না। আমি আবার ভেসে পড়লাম, একা একা ফাঁকা ডেক-এ দাঁড়িয়ে থাকি, বিয়ার খাই, দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আমার কেবল যাওয়া আছে, ফেরা নেই। বয়স বাড়ল। বুড়ো হয়ে যাওয়ার ভয় ঢুকল মনে। সেবার অস্ট্রেলিয়ায় জাহাজ ভিড়লে আবার গাড়ায় পড়লাম। আর একটি মেয়ে। আমাকে দুঃখী দেখে ভালবেসে ফেলল। বুঝলে, মেমসাহেবরা চট করে ভালবেসে ফেলে। আমার বয়স বাড়ছে, মনে হাঁকুপাঁকু। তাই প্রথম বিয়ের কথা গোপন করে বিয়ে করে ফেললাম আবার। আমার এ বউ গরিব অরফ্যান। ভাবলাম, গরিবের মেয়ে হয়তো বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। যথাসাধ্য টাকা-পয়সা খরচ করলাম তার জন্য, একটা বাসা করে দিলাম বন্দরের কাছাকাছি। মাস দুই হানিমুনে কাটালাম। তা আমার এ বউ টিকল। কয়েকবার টুর সেরে তার কাছে ফিরেছি। ফিরে যত্ন আদর পেয়েছি, দেশে ফেরার আনন্দ পেয়েছি। আস্তে আস্তে মন বসে যাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়ায়। ভাবলাম, জাহাজের চাকরি ছেড়ে ওখানেই জমিজিরেত কিনে বসবাস করব। পোলট্রি, ফার্মিং করব।

তা সেবার লম্বা টুরে বেরোনোর সময়ে মনে মনে ঠিক করলাম, এটাই শেষ টুর, আর জাহাজে না। হলদে জাহাজটায় বসবাস করতে করতে আমার মনে ন্যাবা ধরে যাচ্ছে। তা সেবার টুরে বছর দেড়েক লেগে গেল। বউ মাঝে মধ্যে অভাব দুঃখের কথা জানিয়ে টাকা-পয়সার জন্য লিখত। আমি গা করতাম না। মেয়েছেলেদের অভাব কে কবে মেটাতে পেরেছে বলো! দেড়-দু'বছর বাদে ফিরে বাসায় ঢুকতেই মনে হল, এ বাসাটা যেন কেমন কেমন। ঠিক আগেকার মতো ঘর- গেরস্থালির গন্ধ যেন পাচ্ছি না! বউ কেমন চোর-চোখে চাইছে, হঠাৎ হঠাৎ কথার মধ্যে ঝাঝ দিচ্ছে! বিছানায় শুয়ে কেমন যেন অন্য পুরুষের গায়ের গন্ধ পেলাম। তারপর পাড়ায় ঘুরে এ-মুখ সে-মুখ থেকে যা খবর পেলাম তাতে আমি তাজ্জব। আমার বউটা ভাড়াটে মেয়েমানুষ হয়ে গেছে। জাহাজিদের এন্টারটেন করে। ভীষণ রেগে যখন বউয়ের ওপর চোটপাট করে কৈফিয়ত চাইলাম সে উল্টে ঝাড়ল আমাকে, তা কত টাকা-পয়সা আর সোদানা দিয়ে গেছ আমাকে? আমার পেট চলে কী করে? খুব ঝগড়া হল দু'জনে, একনাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা। তারপর আমি বুঝতে পারলাম, ঝগড়া করে লাভ নেই! মেয়েমানুষটা সত্যিই বেশ্যা হয়ে গেছে। কোনও কোনও মেয়েমানুষের মধ্যে নষ্টামির বীজ থাকে। বুঝলে! তারপরও তার কাছে তিন-চারদিন ছিলাম আমি। সেও রাগ-টাগ ঝেড়ে ফেলে আমাকে খুব খাতির যত্ন করল, অন্য কোনও পুরুষ সে ক'দিন ঘেঁষতে দিল না। কিন্তু আমি আর তাকে ঘরে তোলার চেষ্টা করলাম না। বাঁধা মেয়েমানুষের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করে লোকে, সে রকমই ট্রিট করলাম তাকে। সে আপত্তি করল না। তারপর তাকে চিরদিনের মতো ছেড়ে দিয়ে ভেসে পড়লাম আবার। কিন্তু মুশকিল হল, দুই বউয়ের জন্য দু'রকম দুঃখ মাঝে মাঝে বুকের দু'ধারে খামচে ধরে, মাথায় ঝইঝাই শব্দ হতে থাকে। আর কেবলই মনে হয়, আমিই একমাত্র জাহাজি, যার ফেরা নেই, কেবলমাত্র যাওয়া আছে। জাহাজ ভো দিলে আমার বুড়ো হয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ে, মরে যাওয়ার কথা মনে হয়। অবসর সময়ে মদ খেয়ে ঝুম হয়ে থাকি, আর তখন জাহাজের আনাচে-কানাচে ভূত দেখি। এরকম যখন মনের অবস্থা তখন একদিন কলকাতায় জাহাজ ভিড়ল। আমি পাগলের মতো মা বলে ডাক দিয়ে জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে নামলাম, দৌড় দিলাম গ্যাংওয়ে ধরে। ডাঙায় পা দিয়েই খেয়াল হল,

মা ততা নেই। অমনি আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর। কার কাছে যাব? আবার ধীরে ধীরে গ্যাংওয়ে ধরে ফিরলাম জাহাজে। শুন্য জাহাজ, সব জাহাজি গেছে ফুর্তি লুটতে। আমি একা একা ভুতুড়ে জাহাজটার আনাচে কানাচে গিয়ে দাঁড়াই আর কাদি। কাঁদ মরা মা বাপের জন্য, দুই বউ আর না-হওয়া বাচ্চাকাচ্চার জন্য, কাদি দেশের জন্য, কলকাতার জন্য। এইরকম অবস্থায় কয়েকদিন পর আর এক অভিজ্ঞ জাহাজি আমাকে ধরে নিয়ে গেল ওয়েসিস বার-এ। সুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। মেয়েটা বাংলা বলত, ইংরিজিও বলত। শাড়ি পরত, চেহারাটা ছিল সাদামাটা বাঙালি মেয়ের মতো। ভারী ভাল লেগে গেল তাকে, চোখ জুড়িয়ে গেল। বার থেকে সে আমাকে নিয়ে গেল তার ঘরে। ঘরে যিশুখ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি ছিল, কালীর পটও ছিল। বিছানা পরিষ্কার, মাটির কুঁজোয় জল, হাতপাখা, সবই ছিল তার। ভারী আমুদে মেয়ে, বলল, তুমি এখানেই থাকো। থাকলাম। এক রাত্রে খুব জ্যোৎস্না ফুটল আকাশে। রাত তখন অনেক। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় আমাকে স্যু বের করে আনল। ট্যাক্সি করে এসে নামলাম ভিক্টোরিয়ার ধার ঘেঁষে। চারিদিক শুনশান, নির্জন। চুপি চুপি দেয়াল পার হয়ে বাগানে ঢুকলাম দুজনে। ঢুকেই দেখি পৃথিবী ছেড়ে আমরা এক গভীর মায়ার রাজ্যে চলে এসেছি। চারিদিকে মায়াবী ফুল, শিশিরের জল, জ্যোৎস্নার মোম, নরম জলের শব্দ, মাটির সুগন্ধও রকম সুন্দর দৃশ্য জীবনে দেখিনি। সামান্য মদ ছিল দু'জনেরই পেটে, ঝুমঝুম মাতাল ছিলাম দুজনেই। আমরা আনন্দে ঘাসে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। হঠাৎ স্যু লাফিয়ে উঠে বলল, দেখো দেখো, কীরকম বৃষ্টির মতো জ্যোৎস্না পড়ছে! আঁজলা ভরে তুলে নাও। বলে দু'হাত ভরে জ্যোৎস্না খেতে লাগল। মাঝে মাঝে আমার দিকে মুখ তুলে বলে, ইস দেখো, কীরকম হাত উপচে গড়িয়ে পড়ছে, আঁঠার মতো ঘন...কী মিষ্টি..কী স্বাদ...! দেখতে দেখতে আমি ঠিক তার মতো আঁজলা পেতে দিলাম শূন্য আকাশের তলায়। কী আশ্চর্য, অমনি টলটলে ঘন জ্যোৎস্নায় ভরে গেল আঁজলা, উপচে গড়িয়ে পড়তে লাগল। চুমুক দিয়ে দেখি, কী স্বাদ! কী গন্ধ! যত খাই, পিপাসা বেড়ে যায়, ক্ষুধা বাড়ে, শরীর তেজি ঘোড়ার মতো ফুঁসে ফুসে ওঠে। সেই জ্যোৎস্না দেখি, গড়িয়ে যাচ্ছে ঘাসের ওপর, মিশছে জলে, গাছ বেয়ে পড়ছে টুপটাপ। আমরা আঁজলা ভরে খেলাম, ঘাস থেকে চেটে নিলাম, জলে মুখ ডুবিয়ে

খেলাম। জ্যোৎস্নায় স্নান করলাম দুজনে। যতক্ষণ জ্যোৎস্না ছিল ততক্ষণ এক মুহূর্ত আমরা জ্যোৎস্না খাওয়া ছাড়িনি। সে এক অতি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। তিন-চারদিন ছিলাম সুর কাছে। সারা দিনটা রাত্রির অপেক্ষায় কাটত। সন্ধেবেলা দু'জনে হালকা মদ খেয়ে নেশা করে নিতাম। চোখে চোখে আমাদের গোপন বোঝাপড়া হত। রাত গভীর হলেই বেরোতাম জ্যোৎস্নায়। পার হতাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নিচু দেওয়াল। শুরু হত জ্যোৎস্না খাওয়া। আহা!

জাহাজিটা চুপ করে অতীতের কথা ভাবে একটু। লম্বা রথম্যান সিগারেট গৌরের আঙুলে ছাকা দিচ্ছে ছোট হয়ে। জাহাজিটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদভ্রান্তের মতো গৌরের দিকে চায়, বলে, এসব আড়াই-তিন বছর আগেকার কথা, সেই শেষবার কলকাতায় এসেছিলাম। তারপর কত জায়গায় গেছি, কতবার জ্যোৎস্না রাতে মাতাল হয়ে জ্যোৎস্না খাওয়ার চেষ্টা করেছি কত মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু খেতে গিয়ে দেখেছি আঁজলায় কিছু নেই। ফাঁকা। বুঝেছি, স্যু ছাড়া আর কেউ পারে না জ্যোৎস্না খাওয়াতে। সারা পৃথিবীতে একমাত্র স্যু পারে। খুব ভাগ্যবান কেউ কেউ স্যুর দেখা পায় তারা জ্যোৎস্নার স্বাদ জেনে যায়। আর কেউ জানে না।

জাহাজিটা রথম্যানের প্যাকেটটা গৌরের ডান হাতে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করে। বলে, বার ওয়েসিস, স্যু, তাড়াতাড়ি পৌঁছে দাও।

গৌর একটু সময় নেয়। ব্যাপারটা তার এখনও হজম হয়নি।

জাহাজিটা মিনতি করে, দশটার পর স্যু থাকবে না, বার বন্ধ হয়ে যাবে, মেট। মেয়েমানুষের সঙ্গে পুরুষের যে ব্যাপার স্য-র সঙ্গে আমার তা নয়। আমি আর-একবার সেই জ্যোৎস্না খাব। তেষ্টায় বুক জ্বলে যাচ্ছে। গত তিন বছর ধরে আমি কলকাতায় আসার অপেক্ষায় ছিলাম। আজই জাহাজ ভিড়েছে। দুপুর গড়িয়ে নামার পারমিশান পেয়েছি। অন্য জাহাজিরা পাছে সু-র কথা জেনে যায় সেই ভয়ে আমি নেমেছি সবার পরে। এমনই কপাল, সব জাহাজি গাড়ি পেল, বাদে আমি। দু'ঘণ্টা ধরে একটা ট্যাক্সি থামানোর চেষ্টা

করেছি, একটাও থামেনি। সবশেষে তোমার ফাঁকা ট্যাক্সিটা দেখে উঠে বসে আছি, আমাকে ফেলে যেয়ো না, সেই জ্যোৎস্না স্যু ছাড়া আর কেউ খাওয়াতে পারে না মেট। সে পৃথিবীর জিনিস না। সেই মায়াবী বাগান, জ্যোৎস্না, সেইসব ফুল, স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। কী নেশা তার। বয়স কমে যায়। চোখের জ্যোতি বাড়ে। শরীর ফুসে ওঠে। আর-একবার সেই জ্যোৎস্না খেতে পারলে আমি আর কোথাও যাব না। মেট, তাড়াতাড়ি করো, স্যকে যদি অন্য কেউ নিয়ে নেয়!

ঠিক হয় তবে। গৌর বিড়বিড় করে তার মিটারের ঢাকা খোলে, বন্ধ করে গেট। বিড়বিড় করে বলে, দুনিয়ার যত মাতাল আর পাগল গৌরার গাড়ির জন্য রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। চল বাবা ল্যান্ডু, জাহাজিটাকে খালাস দিই।

গৌড় গাড়ি ছাড়ে। পিছনের সিটে ঝিম মেরে থাকে জাহাজিটা। আয় বাবা ধরমতলা, বার ওয়েসিস, জাহাজিটাকে ডেলিভারি দিই। গৌর বিড়বিড় করে। জ্যোৎস্না খাবে, মাইরি, জ্যোৎস্না খাবে! আই! গৌরের ব্যাপারটা হজম হয় না। সে আয়নায় দেখে, জাহাজীটা গম্ভীর স্থিরভাবে ঝুম মেরে আছে। আলোকিত এসপ্ল্যানেড গৌরের দিকে ছুটে আসতে থাকে।

বার ওয়েসিসের সামনে গাড়ি দাঁড় করায় গৌর। জ্যোৎস্না খাবে! মাইরি! গৌরের ধন্দ লেগে আছে এখনও। জাহাজিটা দরজা খোলার জন্য খুটখাট করে, পারে না। গৌর হাত বাড়িয়ে খুলে দেয়। জাহাজিটা নামে। একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলে, কিপ ইট মেট। বলে হাত তুলে বিদায় জানায়। একটু টলমলে পায়ে উজ্জ্বল শুঁড়িখানার দিকে চলে যেতে থাকে।

গৌর চেঁচিয়ে ডাকে, এই, চেঞ্জটা নিয়ে যাও।

জাহাজিটা শুনতেই পায় না।

ভারী অপমান লাগে গৌরের বখশিশ-টখশিশ সে কখনও নেয় না, দরকার মতো মিটারের বেশি পয়সা নেয় নিজের ইচ্ছেমতো। টিকাটুলির বগলাপতির ব্যাটাকে কে দয়া করবে? কোন মালদার? বাপ বগলু তাকে স্বাধীন করে দিয়ে যাওয়ার পর থেকে সে কার দয়া ভিক্ষা করেছে?

গৌর মিটার দেখল। দেড় টাকা। ফেরত-পয়সা গুনে গেঁথে হাতে নিল সে। ফুটো পয়সার জাহাজিটার দয়া গৌর রিটার্ন দেবে।

সাবধানে গাড়িটা লক করে গৌর নামে। লাল কাপড়ে মিটার ঢাকে, তাবপর ধীরেসুস্থে ফুটপাথ পার হয়ে কাচের দরজা ঠেলে শুঁড়িখানাটায় ঢুকে পড়ে।

ভিতরে, শুঁড়িখানায় যেমন হয়, তেমনি নরম আলো-টালে, চেয়ার-টেবিল, কয়েকজন গম্ভীর মাতাল। লম্বা কাউন্টারের ওপাশে কাচের ঝিলিক, নানা রঙের বোতল চিকমিক করে। সেই কাউন্টারে কনুইয়ের ভর রেখে তিন-চারজন মেয়েছেলে।

গৌর দরজার কাছে তার শুখো পায়ের ওপর তেরছা হয়ে দাঁড়ায়। চারদিক দেখে। জাহাজিটাকে নিম-আলোয় ঠিক ঠাহর করতে পারে না। আরও দু'-এক পা এগোয় গৌর। দু'-একজন মুখ তুলে তার নেংচে-হাটা দেখে, একটা মেয়ে নিঃশব্দে হাসে, একজন বেয়ারা মাঝপথে থেমে তাকায়।

গৌর দেখতে পায় ছায়ার মতো জাহাজিটা সারা শুঁড়িখানা চক্কর দিয়ে দরজার দিকে আসছে।

গৌর হাত তুলে ডাকে, এই।

জাহাজিটা তার দিকে তাকায়, বিড়বিড় করে। এগিয়ে এসে গৌরের দুধ দু'হাতে ধরে ঝাকানি দিয়ে বলে, নেই। এখানে নেই। আচ্ছা দাঁড়াও।

বলে গৌরের হাত ধরে টানতে টানতে কাউন্টারের দিকে এগোতে থাকে।

কী হচ্ছে! ছেড়ে দাও।

জাহাজিটা কেবল চাপা গলায় বলে, কম অন। কে এইখানে না পেলে অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে। কম অন।

কাউন্টারের স্যুট-পরা লোকটা মুখ তোলে। জাহাজিটা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চোস্ত জাহাজি ইংরিজিতে বলে, স্য, শ্যামলা পাতলা চেহারা, মিষ্টি মুখ, চোখের পাতা ভারী ভারী, খুব ফুর্তিবাজ, তিন বছর আগে এইখানে তাকে দেখেছিলাম, খোজ দিতে পারো?

লোকটা চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ে, না। ও নামে কাউকে চিনি না। তিন বছর লম্বা সময়, কত কী হয়ে যায়!

বলে লোকটা হাসে।

কাউন্টারে দাঁড়ানো মেয়েদের সবচেয়ে কাছের জন জাহাজিটার পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। সে মুখ ঘুরিয়ে চাপা গলায় বাংলায় বলল, আমরা সবাই স্যু, কেউ কু নই গো!

বলে হেসে অন্য একটি মেয়ের কাধে শরীর ছেড়ে দিল।

জাহাজিটা গম্ভীর মুখ ফিরিয়ে তাকে দ্যাখে, তারপর হতাশ গলায় বলে, না, তোমরা নও। স্যু অনেক জাদু জানত। সে আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।

শোন লতিকা!– বলে সেই মেয়েটি আবার আগের মেয়েটির কাধে হেসে গড়াল। দু'জনেই হাসতে থাকে। গৌরের কান মাথা ঝা ঝাঁ করে। বগলুর পোলা গৌরা এ কোন গাড়ায় এসে পড়েছে! জাহাজিটা ধরে আছে তার শুখো বাঁ-হাতখানা। কমজোরি হাতটা তার, ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নেওয়ার উপায় নেই, চেঁচামেচিও করা যাচ্ছে না।

জাহাজিটা ঠোঁট চেটে বলে, বড় তেষ্টা। চলো একটু বিয়ার খাই।

গৌর মাথা নাড়ে, আমি না। চেঞ্জটা ফেরত নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও।

সেসব কথায় কানই দেয় না জাহাজি। বলে, তেমন কিছু না। একটু বিয়ার, এসো।

তার শুখো হাতখানা ধরে টেনে নেয় জাহাজি, এক টেবিলে পাশাপাশি বসে হাতখানা ধরে রাখে। ফিসফিস করে বলে, তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না মেট। কলকাতায় এক স্যু ছাড়া তোমাকেই আমি চিনি। তুমি ভাল লোক।

দুটো বাহারি কাচের জগ-এ বিয়ার আসে। আসে সেঁকা পাপর, শসা আর পেঁয়াজের চাক। গৌর কিছু বুঝবার আগেই এসব ঘটে যায়। তখনও তার ডানহাতের মুঠোয় ফেরত পয়সা, বাঁ-হাতখানা

জাহাজির কবজায়। ধন্দ ভাবটা গৌরের এখনও কাটেনি। মাথাটা ঝিমঝিম করে। সে একটু ভাববার। চেষ্টা করে, এসব কী হচ্ছে! চোখ বন্ধ করে পুরো ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল গৌর, অমনি তার মাথার মধ্যে একখানা মল-পরা পা ঝম করে তাকে সতর্ক করে দিল। অমনি চোখ খোলে গৌর। মাথা নেড়ে ভাবনা-চিন্তা তাড়াবার চেষ্টা করে।

মদ সে কখনও খায়নি, এমন নয়। খেয়েছে শখে শখে, নেশা করেনি। কিন্তু নেশা করলেই বা কী? এ দুনিয়ায় গৌরের আর ক্ষতির ভয় কী? যদি সে নিজে টিকে থাকে, আর থাকে তার ল্যান্ডমাস্টারখানা, তো এই জীবনটা পিছলে বেরিয়ে যাবে গৌর।

বুক জুড়ে তেষ্টা ছিল। হাতটা ছাড়ানো গেল না। মাথার মধ্যে মল-পরা পা আর-একবার ঝম করার জন্য ধীরে ধীরে উঠছে, টের পেল গৌর। এখনই নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া দরকার। সে ঠান্ডা জগটা ঠোঁটে তোলে। তারপর আকণ্ঠ ডুব দেয় একটা। জাহাজিটা এক চুমুকে সবটা টেনে নেয়। তারপর মুখ তুলে বলে, বড্ড তেষ্টা। বেয়ারা!

বেয়ারা বিনীতভাবে টেবিলে ছায়া ফেলে দাঁড়ায়।

আরও।

বেয়ারা জগ ভরে দিয়ে যায়।

মেয়েছেলেগুলো ঘুরঘুর করে চারপাশে। একটুক্ষণ। তারপরই ঝুপ করে মুখখামুখি চেয়ারে বসে পড়ে দু'জন। কাউন্টারে দাঁড়ানো সেই দুজনই।

একটু খাওয়াও না গো! বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। যে মেয়েটা হেসেছিল সে বলে। তার চোখেমুখে সত্যিকারের তেষ্টা ফুটে আছে। কাছ থেকে এখন তার ভাঙা মুখ, মুখে ঘামে-ভাসা পাউডার, চোখের গাঢ় কাজল দেখা গেল। সিথির কাছে চুল পাতলা হয়ে প্রায় টাক দেখা যাচ্ছে।

তার সঙ্গিনী সেই লতিকা। একটু মোটাসোটা, কালো, পুরু ঠোঁট, বেশি বয়স। মুখখানা গোল, কপাল বেরিয়ে এসেছে ঝুলবারান্দার মতো। সে হাত বাড়িয়ে গৌরের জগটা ধরবার জন্য উদ্যত হয়েও ঠিক সাহস পায় না, হাতটা টেবিলের ওপর ওইভাবেই ফেলে রেখে বলে, নতুন পেগ না নাও, তোমাদের গেলাস থেকেই ঢেলে দাও একটু করে।

বলে সে টেবিলে উপুড় করে রাখা পাতলা গ্লাস উলটে বাড়িয়ে ধরে, দাও।

এইসব মেয়েছেলেদের বিস্তর দেখেছে গৌর। প্রায় একই রকম শ্রীহীন চেহারা, কেউ একটু রোগা, কেউ মোটা। মুখে প্রচুর পাউডার, লিপস্টিক, চোখে কাজল, পরনে ঝলমলে শাড়ি। তার ল্যান্ডমাস্টারে মাঝে মাঝে এরকম মেয়েরা খদ্দেরের পয়সায় ফুর্তি ললাটে। টের পেলে তোলে না গৌর, ভুল করে তুললে আয়নায় বিস্তর নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখা যায়।

স্বাভাবিক অবস্থায় হলে গৌর তাড়া দিত, কিন্তু বিয়ারের আঁঝটা তার পেট থেকে মগজে রিনরিন করে ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন ওজন নেওয়ার যন্ত্রে পয়সা ফেললে রিনরিন শব্দটা বহুদুর গভীরে গড়িয়ে যায়। গৌর তাই রাগ করে না। কেবল অবাক হয়ে বলে, এঁটো খাবে?

এঁটো আবার কী গো!–প্রথম মেয়েটা বড় চোখে চেয়ে হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে, মুখের এটোকে এঁটো ধরলে আমরা তো পচে গেছি।

আমাদের সবকিছু এঁটো!

বড় অশ্লীল কথা। অঙ্গভঙ্গিও ভাল না। গৌরের বড় ঘেন্না করে। সে অর্ধেক জগ মোটা মেয়েটার গ্লাসে ঢেলে দেয়, বাকি অর্ধেক টেনে নেয় নিজে। তারপর শ্বাস ছেড়ে মেয়ে দুটোকে বলে, এবার ফোটো। যথেষ্ট হয়েছে।

জাহাজিটা জগ-এ লম্বা ডুব মেরে মুখ তোলে। মেয়েদুটোর দিকে তাকিয়ে মাতাল হাসি হাসে, বলে, আরও খাবে? খাও। বেয়ারা।

মেয়েদুটো আনন্দে, সুখে ভেসে যায়। বেয়ারা বিনীতভাবে দুটো জগ ভরে দিয়ে যায়।

এবার বলো। জাহাজীটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে।

কী?– মেয়েরা ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে।

স্যু-র কথা।

মেয়েদুটো রুমালে মুখ চেপে হাসে।

কেমন ছিল তোমার স্যু?–রোগা জন জিজ্ঞেস করে।

লম্বা। সোনালি চুল। নীল চোখ। খুব ফরসা।

যদিও মাথাটা একটু গুলিয়ে যাচ্ছে তবু গৌর বোঝে জাহাজিটা ঠিক কথা বলছে না। সে মুখ ফিরিয়ে বলে, এই, তুমি যে একটু আগে বললে, শ্যামলা রং, চোখের পাতা ভারী ভারী।

লম্বা রথম্যান ধরিয়ে জাহাজিটা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ভাববার চেষ্টা করে। বলে, বলেছি?

নিশ্চয়ই।- গৌর ডানহাতে টেবিলে চাপড় মারে।

জাহাজিটা শ্বাস ছেড়ে বলে, তবে তাই।

মাতাল। গৌর হাসে।

জাহাজিটা প্রশ্ন করে, চেনো?

মোটা মেয়েটা মাথা নাড়ে, না।

সে আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।

রোগা মেয়েটা তার লম্বা দাতগুলো বের করে গরগরে হাসি হাসে, জ্যোৎস্না আমরাও খাওয়াতে পারি। চাদের আলো, ফুলের গন্ধ, কত কী খাওয়াই আমরা।

জাহাজিটা স্থিরভাবে মেয়েটিকে লক্ষ করে, তারপর গম্ভীর গলায় বলে, পৃথিবীর সাত ঘাটের মেয়েমানুষ আমাকে ওই কথা বলেছে। কেউ পারেনি। তিন বছর ধরে আমার বুক তেষ্টায় কাঠ হয়ে আছে।

গৌরকে একটা কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে উঠে দাঁড়াল জাহাজি।

চলো মেট, সময় নেই।

তারপর মেয়েদুটোর দিকে চেয়ে বলল, তোমরা খাও। সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না, তার জন্যে দুঃখ কোরো না। সময় বড় মূল্যবান, নইলে আমি তোমাদের সঙ্গে আর একটু সময় কাটাতাম।

জাহাজিটা বিল মেটায়। গৌরের হাত ধরে বেরিয়ে আসে।

গৌর চারদিকে একটা রিমঝিম আনন্দকে টের পাচ্ছিল। ঠিক নেশা নয়। কিন্তু রাস্তা দোকান সিনেমাহল-এর আলোগুলো আরও রঙিন, মানুষেরা ভারী আনন্দিত। চরাচর জুড়ে ফুর্তির বাতাস বয়ে যাচ্ছে। জাহাজিটাকে মনে হচ্ছে বহুকালের পুরনো বন্ধু, মাঝখানে কেবল একশো বছর দেখা হয়নি।

দু'জন সৈন্যের মতো পায়ে পা মিলিয়ে তারা পাশাপাশি হেঁটে ল্যান্ডমাস্টারের কাছে আসে।

এবার কোথায়?

জাহাজিটা চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ে, স্যু যেখানে। খুঁজে বের করতে হবে। কাছাকাছি কোনও বার-এ সে আছে।

গৌরের এখনও যাকে নেশা বলে তা হয়নি ঠিক। গাড়িটা সে দিব্যি চালায়। জাহাজি তার বা পাশে, মাঝখানে সিটের ওপর রথম্যানের প্যাকেটটা পড়ে আছে। সবই বুঝতে পারছে গৌর। না, নেশা হয়নি। গাড়িটা মাখনের মতো যাচ্ছে।

ব্যস মেট। একবার এ জায়গাটা

জাহাজি হাত বাড়িয়ে গৌরের হাত চেপে ধরে।

গৌর গাড়ি থামায়। বাঁ পাশে আর-একটা বার। খুব বড় নয়, কিন্তু জায়গাটার বেশ ফুর্তিবাজ চেহারা। আলোয় আলোময়। দুঃখ-কষ্টের কথা ভুল পড়ে যায় মানুষের।

জাহাজি হাত ছাড়ে না।

নামো।

গৌর হাই তুলে বলে, আমি বরং বসে থাকি, তুমি খুঁজে এসো।

না, আমি একা খুঁজে পাব না। শহরটা বড় অচেনা লাগছে, নামো মেট।

গৌর নামে।

জায়গাটা ফুর্তিবাজ ঠিকই। ঢুকতেই আচমকা একটা মোলায়েম শীতভাব জড়িয়ে ধরে। গিজগিজ করছে লোজন, কাউন্টারে বেয়ারাদের ভিড়। একধারে কাঠের পাটাতনে মাইক্রোফোনের মাউথপিস মুখের কাছে ধরে দরাজ গলায় গান গাইছে কালো চেহারার একটা লোক, বোঙ্গো বাজছে দমাদম। লোকটা দুলে দুলে ঘুরে ঘুরে গায় হিন্দি বিষাদসংগীত। তবু ফুর্তির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সুদিন এসে গেছে এইখানে। গান গাইছে টাবু। টাবু সিংগস! আঙুরের রস তার গলা ছুঁয়ে ফোটা ফোটা গড়িয়ে পড়ছে মনের গেলাসে।

সিনেমার মতোই কাচ লাগানো একটা কাউন্টারের ওপাশে সাহেবি চেহারার দু'জন তোক ভারী ব্যস্ত। টাকা-পয়সা গুনে নিচ্ছে। জাহাজিটা কাচের ওপর টোকা দিতে দু'জন মুখ তোলে।

স্যু নামে একটি মেয়ে, গায়ের রং শ্যামলা, বাদামি চুল, নীল চোখ–

–মাতাল। গৌর হাসে। বলে, অ্যাই, গায়ের রং শ্যামলা হলে চোখ নীল হয় কী করে? অ্যাঁ!

হয় না?– ভারী অবাক হয় জাহাজি। বলে, তবে কী রকম চোখ ছিল তার?

গৌর একটু ভাববার চেষ্টা করে। মাথা রিমঝিম করে তার। তবু বুদ্ধি খাটিয়ে সে বলে, কালো।

তো তাই।

জাহাজিটা আবার লোকদুটোর দিকে ঝুঁকে বলে, তার চোখ আর চুল কালো, খবর দিতে পারো? লোকদুটো গম্ভীর বিনীত মুখে শোনে। একজন নরম গলায় বলে, দুঃখিত। আমাদের এখানে নেই।

আমরা একটু ঘুরে দেখি জায়গাটা?

অফ কোর্স। বেয়ারা নিয়ে যাবে তোমাদের।

আধবুড়ো ভদ্র এক বেয়ারা তাদের নিয়ে যায়। টাবুর গান থেকে দূরে ছায়াচ্ছন্ন কোণের টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বলে, ড্রিংকস?

হুইস্কি। বলে ক্লান্তিতে টেবিলে মাথা রাখে জাহাজি।

এই!

ডাক দেয় গৌর।

অনেকক্ষণ বাদে মাথা তোলে জাহাজি। চোখ রক্তজবা। গলায় টাবুর বিষাদসংগীতের বিষাদ এসে বাসা নিয়েছে। বলে, এখানে স্যু নেই। এসব তার জায়গা নয়। আরও নিরিবিলি জায়গায় তার থাকার কথা।

বোঙ্গোর শব্দ মৃদু গুঁড়ো হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। টাবু তার বিষাদসংগীতের করুণতম অংশে এসে গেছে। ঘুমপাড়ানির মতো মৃদু, অরুদ্ধ তার গলা। যেন বা এই রাত আর ভোর হবে না। মহাপ্লাবনে ভেসে যাবে পৃথিবী। টাবুর অনন্ত বিষাদ বুকে নিয়ে সরে যাবে মানুষ। লোকে তাই শেষ আনন্দটুকু গেলাস থেকে তুলে নিক।

গৌর নিল। জাহাজিও।

আমি জানি স্যু এখানে নেই। এখানে থাকলে তার গায়ের গন্ধ পেতাম। জাহাজিটা ফিসফিসিয়ে বলে।

গৌরেরও তাই মনে হয়। তার চোখে কোনও মেয়েছেলে পড়ে না। তবু সে একবার চারদিক চেয়ে দেখে, না, নেই।

হঠাৎ উদ্দাম হয়ে ওঠে বোঙ্গোর শব্দ। দুলে ওঠে টাবু। আশা-নিরাশায় দোলে মানুষের মন।

চলো মেট।

গেলাস শেষ করে গৌর ওঠে। একটু দোলে তার শরীর। মাথা ফাকা লাগে। তবু বলে, চলো।

কোথাও না কোথাও আছেই।– জাহাজি আত্মবিশ্বাসে বলে।

গৌর তা বিশ্বাস করে। কলকাতার জ্ঞান তার নখে নখে। কোথায় যাবে জাহাজির মেয়েছেলে স্যু? গৌর ঠিক বের করবে।

.

যদিও একটু দুলছে কলকাতার রাস্তাঘাট, তবু গৌর, বগলুর ছাওয়াল, যার হাতে গাড়ি কোনওদিন ঘষাটাও খায়নি, ঠিক গাড়িটা বের করে আনল চৌরঙ্গির বড় রাস্তায়।

ওই যে দেখছ উঁচু মিনার, ওই যে

এই বলে জাহাজি গৌরকে কনুইয়ে ঠেলা দিয়ে অদুরের মনুমেন্টটা দেখায়। গৌর দেখে।

জাহাজি গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলে, ওই মিনারটা আমি আমার মায়ের চিতার ওপর তুলেছিলাম। ভাল হয়নি?

মনুমেন্টটাকে আবার ভাল করে দেখে গৌর। দেখে-টেখে মাথা নেড়ে বলে, ভাল। দিব্যি উঁচু।

আই।

জাহাজি শ্বাস ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়।

.

পার্ক স্ট্রিটকে কখনও কলকাতা বলে মনে হয় না গৌরের। বিয়ারের মাথায় হুইস্কি বসে আছে পেটে। এখন তাই আরও মনে হয় না। স্পষ্টই যেন লন্ডনের এক রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করায় গৌর।

জাহাজি বলে, লন্ডন হুবহু এরকম।

গৌর হাসে।

সামনেই একটা বিশাল রেস্তরাঁর চওড়া মুখ, সে মুখে হাসি।

গেট-এর কাছে দু'জন সাহেবি পোশাক পরে দাঁড়াননা। তারা সিড়িতে পা দিতেই দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল আপনা থেকেই। ভারী অবাক হয় গৌর। এরকম জাদুই দরজা সে আর দেখেনি। দরজাটা পরখ করার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সে, জাহাজিটা হ্যাচকা টান দিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে গেল।

কম অন। সময় নেই। এখনও আকাশে জ্যোৎস্না রয়েছে, দেখছ না?

গৌর আকাশ দেখার জন্য মুখ তুলল। তুলে দেখল, সুন্দর সিলিং, তাতে নরম রঙের ওপর মানুষের কত কারুকাজ, কাচে ঢাকা আলো। জ্যোৎস্নার মতোই। কিংবা ঠিক জ্যোৎস্নার মতো নয়। কিন্তু সুন্দর।

তারা কার্পেটের ওপর দিয়ে হাঁটে। কী নরম! এরকম কার্পেটের ওপর হাঁটলে গৌরের শুখো পায়ে কোনও ব্যথা লাগে না। কার্পেটটা একবার ছুঁয়ে দেখার জন্য হাঁটু গেড়ে বসতে যাচ্ছিল গৌর। জাহাজি তাকে টেনে তুলল।

সময় নেই মেট।

ওঃ হ্যাঁ, ঠিক। গৌর বুঝতে পারে।

এমন সুন্দর জায়গা, তবু কেউ কোথাও তাদের পথ আটকায় না। বলে না ভিতরে যাওয়া বারণ। কেন বলে না? অ্যাঁ! গৌর বুঝতে পারে না। তার দাদা রাখোহরি যখন এসব জায়গায় আসত, গৌরই পুরনো ডজ গাড়িটায় নিয়ে আসত তাকে। স্যট আর বোপরা বিলেতফেরত সুন্দর চেহারার রাখোহরি অনায়াসে ঢুকে যেত সব জায়গায়। পালকের ঝাড়নে ডজ গাড়িটার গা মুছতে মুছতে ভয়ের চোখে চেয়ে দেখত গৌর। তার ধারণা ছিল, হাফ-ফিনিশ গৌরার এসব জায়গায় অ্যাডমিশন নেই। সেই ধারণা নিয়েই সে এত বড়টা হল। অথচ আশ্চর্য! আশ্চর্য! সব দরজা খুলে যাচ্ছে আপনা থেকে, একটু নেংচে হাফ-ফিনিশ গৌরা, বগলুর ছাওয়াল, অর্থাৎ কিনা বগলাপতির তিন নম্বর, আজ যে সব জায়গায় চলে যেতে পারছে। কী হচ্ছে এসব! অ্যাঁ! এরকম আর দেখেনি গৌর। প্রজাপতি, রামধনু, সুন্দরীর চোখ, এইসব জিনিস দিয়ে যেন তৈরি হয়েছে এই দোকান। এখানে দেয়াল নেই, কড়িকাঠ নেই, দরজা জানালা নেই, কেবল আলো আর রং, গন্ধ আর সুন্দর শব্দ, একটু স্বপ্ন আর কল্পনার মিশেল। পৃথিবীরই, তবু ঠিক পৃথিবীতে নয়। একটু উঁচুতে যেন বা বাতাসে ভর করে আছে জায়গাটা! বাতাসে ভর করে আছে? সত্যি? পরীক্ষা করে দেখার জন্য কয়েকটা লাফ দিল গৌর। দেখল দোলে কি না। হ্যাঁ, দোলে। একটু একটু।

জাহাজি তাকে টেনে বসায়, গভীর পালকের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে গৌর। টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে ডুবে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচায়।

কে যেন মুখের কাছে ভরা গেলাস রাখে। গৌর ঠোঁটে তোলে গেলাস। আনন্দে চোখের জল নেমে আসে।

একটা ভিতর প্রকোষ্ঠের দরজা নিঃশব্দে খোলে। উদ্দণ্ড ড্রামের শব্দ, সাপুড়ের বাঁশির শব্দ শোনা যায়। আবার দরজা বন্ধ হয়। শব্দটা ক্ষীণ হৃৎপিন্ডের শব্দের মতো ঢিপঢিপ করে বাজে।

জাহাজিটা হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়ায়।

চলো মেট, শিগগির।

কোথায়?

ওইখানে। ভিতরে কোথাও নাচ হচ্ছে, একটা মেয়ে, স্যু হতে পারে।

গৌর ওঠে।

সত্যিই একটা রঙিন দরজা রয়েছে। সামনে সতর্ক পাহারা। তারা দরজার সামনে দাঁড়াতেই একটা হাত এগিয়ে আসে।

টিকিট?

জাহাজি হিপ পকেট থেকে টাকার গোছাটা টেনে বের করে। অফুরন্ত টাকা। দরজা খুলে যায়।

লোলা নাচছে স্পটলাইটে। আলো থেকে অন্ধকারে চলে যায় লোলা। আলোটা ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজে বের করে। লোলার বাদামি শরীরের চামড়া যেন তেল মাখা। চামড়ার তলায় তার খেয়ালি নরম মাংসের ঢেউ। কোমরে জাফরান রঙের পুঁতির ছোট্ট ঘাগরা, বুকে জাফরানি পুতির কঁচুলি, মাথার চারদিকে ঘিরে আছে এক সবুজ সাপ, চুলের চূড়ার ওপর তার ফণা। আলো থেকে অন্ধকারে, আবার আলোয়, মায়াবী যাতায়াত করে লোলা।

পৃথিবীর পুরুষকে ডাক দেয় তার পায়ের তলায়। নরমুণ্ড লুটিয়ে পড়ে পায়ে। লোলা অন্ধকারে, আবার আলোয়, আবার অন্ধকারে, তার জাদুকরী মুদ্রাগুলি ছিটিয়ে দেয়। আলো তাকে চঞ্চল হয়ে খোঁজে, খোঁজে অন্ধকার। চারদিকে অনেক মানুষ, কাউকে দেখা যায় না। কেবল অন্ধকারে সিগারেটের আগুন তীব্র হয়ে উঠে মিইয়ে যায়। খাস পড়ে, খাস ওঠে, কাউকে দেখা যায় না। চরম মুহূর্তের কাছে উঠে যায় ড্রামের অসহ্য আনন্দের শব্দ-লোলা-লোলা-লোলা।

হঠাৎ আলো নিভে যায়। গৌর টপ করে চোখ বুজে ফেলে। আজ পর্যন্ত সে কখনও ন্যাংটো মেয়েমানুষ দেখেনি।

অন্ধকারেই জাহাজি তার হাত চেপে ধরে, মেট, এ নয়।

নয়?

নাঃ।

অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে তারা বেরিয়ে আসে। পিছন ফিরে তাকায় না। কিন্তু তখন লোলা তার ঘাগরা ছেড়েছে, কঁচুলি দিয়েছে ফেলে। অন্ধকারে সে দাঁড়িয়ে। পাগলের মতো আলো তাকে খুঁজছে। লোলা দু'হাত বাড়িয়ে আলোকে বলছে। এসো, এসো, এইখানে পৃথিবীর প্রিয়তমা লোলা।

তবু সে স্যু নয়। হতাশ জাহাজিকে সে খাওয়ায়নি অলৌকিক জ্যোৎস্না। দুটি দুঃখী লোক তাকে অবহেলা করে চলে গেল।

দুটি মানুষের কাছে ব্যর্থ লোলার নগ্ন শরীরে তখন লাল নীল সবুজ আলোগুলো পাগলের মতো এসে আঘাত করছে, মাঝে মাঝে এগিয়ে যাচ্ছে। আর তখন গৌরের ল্যান্ডমাস্টার পার্ক স্ট্রিট ছেড়ে উড়ে যেতে থাকে স্যু-র খোঁজে।

আই! গৌর টের পায়, গাড়িটা উড়ছে। উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে পার্ক স্ট্রিটের আলোর ধাঁধা। গৌর চোখ কচলে নেয়। মোড়ের ট্রাফিক বাতি দেখতে পাচ্ছে না সে, দেখবার দরকারই বা কী! গাড়িটা উড়ছে যখন।

মেট!– জাহাজি মৃদুস্বরে বলে।

উম।

নেশাটা কেটে যাচ্ছে। কলকাতার শুঁড়িরা মদে জল মেশায়।

হবেও বা। গৌর জানে না। সে বুকে রাস্তাটা দেখে। ফাকা হয়ে এসেছে রাস্তা। চোরাগলির অন্ধকার মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে। চলেছে মাতাল, ভিখিরি, মতলববাজ লোক, এসবের ওপরে ওই আকাশ। জ্যোৎস্না ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। ওই আকাশে থাকেন ফাদার ফ্রান্সিস। তাকে ঘিরে থাকে স্বপ্নের শিশুরা। লাল নীল সবুজ বল গড়িয়ে সারা দিনমান শিশুদের সঙ্গে খেলা করেন ফাদার। পৃথিবীর ওপরে যে আকাশটা আছে সেটা মানুষের বাবার ভাগ্যি। গৌর মাঝে মাঝে তাই চোখ তুলে আকাশখানা দেখে। ভারী খুশি হয়। গাড়িটা আর-একটু উঁচুতে উঠে যায়। ভাল লাগে গৌরের। সে মুখ ফিরিয়ে বলে, দেখ, কত উঁচুতে উঠেছি।

জাহাজিটা গলা বাড়িয়ে নীচের দিকে চায়, তারপর বলে, আর একটু ওপরে ওঠো মেট। স্যু বোধহয় পৃথিবীতে নেই। এখানে বড় ধুলো ময়লা, নোংরা মানুষ। এ সব দেখে সে বোধহয় উঁচুতে উঠে গেছে।

মাতাল। গৌর আপনমনে হাসে। একটা লাল সিগন্যাল পেরিয়ে যায়। পুলিশ নেই। কেউ তাকে থামায় না।

জাহাজিটা এলিয়ে পড়েছে সিটে। বিড়বিড় করে বকছে, বাড়ি বাড়ি খুঁজব। ভিখিরিদের মুখ দেখে দেখে ফিরব। প্রতিটি খুঁড়িখানায়, বেশ্যার ঘরে, দোকানে, অফিসে। কোথায় যাবে?

গৌর রাস্তাটা ভাল দেখতে পায় না। কুয়াশা হয়েছে নাকি? কিংবা স্বপ্ন দেখছে? সামনের রাস্তাটা জুড়ে পরি নামছে। শিশু-পরি সব। ন্যাংটো, ফরসা, সুন্দর। দুটো করে ছোটো ডানা। গাছে গাছে ফলের মতো ঝুল খাচ্ছে। রাস্তায় খেলা করছে। ব্রেক কষে গৌর। চোখ মুছে নেয়। হর্ন দেয়। চাপা পড়বে যে বাবারা সব! ওড়ো, উড়ে যাও।

তারপরই হাসে গৌর। চাপা দেবে কী? উড়ন্ত গাড়ি কাউকে চাপা দেয় না। গৌর আবার গাড়ি ছাড়ে। আকাশে ফাদার ফ্রান্সিস রয়েছেন। শিশুদের তিনিই সরিয়ে নেবেন। ভয় নেই।

কলকাতার শুঁড়িরা মদে জল মেশায়, বুঝলে মেট? ভীষণ জল মেশায়। বলে হেঁচকি তোলে জাহাজি।

গাড়িটা জোরে চালাও মেট। নইলে জমছে না। আমার নেশা কেটে যাচ্ছে।

পাগলা! জোরে চালালে ওদের গায়ে ধাক্কা লেগে যাবে।

কাদের?–জাহাজি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

ওই যে, পরিরা নেমেছে সব। বাচ্চা পরি, ভাল উড়তে শেখেনি এখনও।

জাহাজি ঝুঁকে রাস্তাঘাটে পরি দেখার চেষ্টা করে।

কোথায় পরি?

শালা মাতাল। দেখতে পাচ্ছে না। গৌর হাসে।

ওই তো। সব জায়গায় রয়েছে। গাছে ঝুল খাচ্ছে, রাস্তায় খেলছে, আকাশে উড়ছে, কোথায় নেই? ওই দেখো একজন আমার গাড়ির বনেটে বসল, ওই আবার উড়ে গেল। নীল চোখ, কী সুন্দর নীল চোখ।

জাহাজি শ্বাস ফেলে বলে, দেখতে পাচ্ছি না। কলকাতার শুড়িরা বড্ড জল মেশায় মদে।

কিন্তু পরিরা আছে ঠিক। সেন্ট অ্যান্টনিজে এরকম পরিদের ছবি ঘরে ঘরে ঝোলানো থাকত। সোনালি ডানা, লাল ঠোঁট, নীল চোখ...।

জাহাজি বুক কাঁপিয়ে শ্বাস ফেলে, নীল চোখ নীল চোখ। সুরও ছিল ওই নীল চোখ। ঠিক নীল নয়, একটু বাদামি। কিন্তু ওর গায়ের রং ছিল বড় কালো। যখন ঘরের আলো নিভিয়ে দিত, বুঝলে, যখন ঘরের আলো নিভিয়ে দিত তখন ওকে কিছুতেই খুঁজে পেতাম না। ওর ওই কালো রঙের জন্যই। সু-র বুকভরা দিল, একশো মজা। বাতি নিভিয়ে সে লুকোত, আর আমি দুহাত বাজিয়ে তাকে খুঁজতে খুঁজতে কখনও দেয়ালে, কখনও ওয়ার্ডরোবে, কখনও খাটের বাজুতে ধাক্কা খেতাম। ও লুকোত খাটের তলায়, আলমারির ভিতরে কিংবা ছেড়ে রাখা পোশাকের নীচে। একশো মজা ছিল ওর। বড্ড কালো ছিল বলে

কালো!– গৌর ভারী অবাক হয়, কালো কোথায়! তুমি যে বললে, ফরসা আর নীল চোখ!

বলেছি?

আলবাত!

তবে তাই। জাহাজিটা গভীরভাবে মাথা নাড়ে, তবে তাই। কিন্তু তাহলে অন্ধকার ঘরে ওকে খুঁজে পেতাম না কেন?

গৌর হাসে, দূর। অন্ধকার ঘরে কালোই কী, ফরসাই কী? সব সমান। সোজাসুজি একটা নিয়োন সাইন ছিল। কী যেন সাইনটা! আঃ হাঃ, কী যেন? ঠিক মনে পড়ছে না, কী যেন?

লিপটন? লুফটাহানসা? গুড ইয়ার? ক্যাপস্টান?

নাঃ। ওসব নয়। কলকাতার শুড়িরা–

জাহাজি হেঁচকি খেল।

যেতে দাও।- গৌর বলে।

জাহাজিটা মাথা নাড়ে, না না। যেতে দেব কেন? সেই নিয়োন সাইনটা ছিল খুব ইম্পর্ট্যান্ট। খুব। দাঁড়াও মনে করি।

জাহাজি মুখে আঙুল পুরে ভাবে। শিস দেয় মাঝে মাঝে। ওদিকে রাস্তায় পরিরা আরও নামছে। কলকাতা জুড়ে কেবলই পরি নেমে আসছে। দু-তিনজন গাড়ির জানালা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। কাচ ভোলা বলে পারছে না। আহা! গৌর হাত বাড়িয়ে পিছনের জানালার কাচ নামায়। বোসো বাবারা। বসে থাকো! আমি তোমাদের পুরো কলকাতা দেখিয়ে দেব।

ইয়াঃ! সেই নিয়োন সাইনে লেখা ছিল–ইউ ওয়ান্ট লায়লাজ ব্রেড। তুমি চাও লায়লার রুটি। প্রথমে জ্বলত 'তুমি', তারপর চাও,তারপর লায়লার', সবশেষে 'রুটি', চারটে শব্দ। তুমি' জ্বললে। ঘরটায় স্বচ্ছ আলো আসত-সবুজ আলো। দ্বিতীয়টা ছিল 'চাও', সেটা জ্বললে আরও একটু সবুজ আলো আসত। তারপর লায়লার' থেকে রুটি পর্যন্ত চমৎকার আলো হত ঘরে। সবুজ আলোয় ভরে যেত ঘর। মনে হত, মাঠঘাট, সবুজ ঘাস এই সবের মধ্যে রয়েছি। আবার হঠাৎ দপ করে নিভে যেত আলো, কী অন্ধকার এখন। ঘুটঘুট্টি। হঠাৎ আবার জ্বলে উঠত–"তুমি', তারপর 'চাও', তারপর

জাহাজিটা হেঁচকি তোলে।

পিছনের জানালা গলে তিনটে পরি ঢোকে। গৌর আড়চোখে আয়নায় দেখে নেয়। ন্যাংটাপুটো, সাদা। মোটা মোোটা থাোরা, নধর হাত, নাদা পেট। সোনালি ডানাগুলো পাতলা ফিনফিনে, যেন বা মাকড়সার জালে তৈরি পাখাগুলো থিরথির করে কাঁপে।

ই-ফ!– জাহাজি আবার হেঁচকি গেলে।

চোপ!–ধমক মারে গৌর, হেঁচকি তুলো না। পরিরা ভয় পাবে।

জাহাজি অবাক হয়ে বলে, কারা বললে?

পরিরা।

কোথায়?

পিছনের সিটে বসে আছে। তিনজন। এখন হেঁচকি তুলো না।

জাহাজি মুখ ফিরিয়ে দেখে। তারপর বলে, কোথায় কী?

আছে। তাকিয়ো না।

জাহাজি গম্ভীর হয়ে বলে, আসলে কলকাতার শুড়িরা

বলে ঠোঁট চাটে জাহাজি। গৌর গাড়িখানা কঁকা রাস্তায় ঘোরাতে থাকে। ড্যাশবোর্ডে তেলের কাটা নেমে যাচ্ছে। গৌর তা লক্ষ্য করে না। সে কেবল চরাচর জুড়ে পরিদের কাণ্ড দেখে।

জাহাজিটা বলে, আমরা জানালায় বসে সেই নিয়োন সাইনটা দেখতাম।

কোন নিয়োন সাইন?

সেই যে, তুমি চাও লায়লার রুটি। সবুজ রঙের নিয়োন সাইন। ঘরটা সবুজ আলোয় চমকাত। আমি স্যুকে জিজ্ঞেস করতাম, স্যু, লায়লা কে? ও আমাকে জিজ্ঞেস করত, লায়লা কে? আমরা কেউ বলতে পারতাম না। অথচ নিয়োন সাইনটা সন্ধে রাত্রি থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সবুজ আলো দিয়ে একই কথা বলত, তুমি চাও...তুমি চাও..তুমি চাও...লায়লার রুটি। আমি সুকে জিজ্ঞেস করতাম, স্য, তুমি লায়লার টানে বাত, চাই। ফের সে আমাকেও ওই কথা জিজ্ঞেসকরত, আমিও চাই কি না, আমি বলতাম, চাই। কিন্তু মেট, খুঁজে দেখেছি, সেই রুটি পাওয়া যায় না।

পাওয়া যায় না?

না।

সে কী! তাহলে নিয়োন সাইনটা ছিল কী করতে?

জাহাজিটা একটু ভেবে বলে, অবিশ্যি দিনের বেলা তো কখনও লায়লার রুটির খোঁজ করিনি। দিনের বেলা মনেই থাকত না। রাত্রি বেশি হলে যখন নিয়োন সাইনটা নজরে পড়ত, তখন আমরা খুঁজতে বেরোতাম। পাওয়া যেত না। মেট, সেই থেকে লায়লার রুটির জন্য আমি অস্থির হয়ে আছি। এখনও মাঝে মাঝে মাঝরাতে ঘুমে আমি স্বপ্ন দেখি, নিয়োন সাইন জ্বলে জ্বলে উঠছে, তুমি চাও...তুমি চাও...তুমি চাও...ভয় পেয়ে উঠে বসি, আর তখন বাদবাকিটা মনে পড়ে, লায়লার রুটি...লায়লার রুটি...লায়লার রুটি...

মাতাল। গৌর হাসে।

জাহাজিটা ঠোঁট চাটে। একটা রথম্যান ধরাবার চেষ্টা করে। দেশলাই জ্বালতেই গৌর ধমকায়, আলো জ্বেলো না।

কেন?

পরিরা পালাবে।

আঃ! জাহাজি হতাশভাবে সিগারেট ফেলে দেয়। তারপর বলে, লায়লার রুটি। সবুজ আলো, স্যু, জ্যোৎস্না–মেট, এসব কোথায় গেল? কলকাতা একদম শুকিয়ে গেছে যে। কিছু নেই।

গাড়িটা আপনা থেকেই ঘুরেফিরে চলে যাচ্ছিল। গৌর দিক ঠিক করতে পারে না। আসলে গাড়ি যখন মাটির ওপর দিয়ে যায় তখন রাস্তাঘাট ঠিকই চিনতে পারে গৌর, গৌরা, বগলাপতির ব্যাটা। তখন তার সব ইন্দ্রিয় সজাগ থাকে। কিন্তু এখন, এই পরিদের রাজ্যে চলে এলে, মাঝরাতে দিক নির্ণয় করা ভারী মুশকিল। গাড়ি তখন নিজের থেকেই চলে। গৌর কেবল নিমিত্তমাত্র।

চাঁদ ঢলে পড়েছে। আকাশের একদিকটা কালিবর্ণ, বেশ্যার চোখের কাজলের মতো, সেই কালিবর্ণে ফ্যাকাসে শসার মতো চাঁদ ঢলে পড়ে যাচ্ছে। গৌর এই মর্মান্তিক দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

জাহাজি হঠাৎ আঁতকে উঠে বলে, এটা কোন জায়গা! অ্যাঁ! কোন জায়গা? থামো মেট।

গৌর থামে।

একটা পুরনো প্রকাণ্ড বাড়ি বটগাছের মতো দাঁড়িয়ে। অন্ধকার। রাস্তাটা নিঝঝুম। চারদিকে সুনসান নির্জনতা। রাস্তায় সারি সারি গাছ। গাছের আড়ালে আড়ালে রাস্তায় টিমটিমে আলো। হাওয়ায় গাছের পাতা নড়লে আলোগুলো দোল খেয়ে যেতে থাকে। গৌর রাস্তাটা ঠিকঠাক চিনতে পারে না। গভীর গলায় বলে, কী জানি!

জাহাজিটা মুখ তুলে বাড়িটা দেখে।

মেট!

উম।

এই বাড়িটা আমার চেনা।

গৌরও বাড়িটা দেখে। কলকাতার প্রথম বয়সে তৈরি বাড়ি। পলেস্তারা খসে পড়ছে। বোধহয় কর্পোরেশনের নোটিশ পেয়েছে। ভেঙে ফেলা হবে। তাই সবাই ছেড়ে গেছে বাড়ি। একা অন্ধকার বাড়িটা আয়ুর শেষে ক'টা দিন নির্জনে ঝিমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে।

গৌর হাই তোলে।

জাহাজি হঠাৎ গৌরের হাত চেপে ধরে বলে, বাড়িটা আমি চিনি মেট। এখানে আমি এসেছি।

কার কাছে?

জাহাজি ফিসফিস করে বলে, স্যুর কাছে।

গৌর চমকে বলে, এই বাড়িটাই?

তারা নামে। আগে জাহাজি, পিছনে গৌর।

বাড়ির দরজাটা হাঁ হাঁ করছে খোলা। একটা পাল্লা বাতাসে নড়ে চামচিকের মতো শব্দ করছে। আরশোলার নাদির গন্ধ পাওয়া যায়। আর বহু পুরনো এক বদ্ধ বাতাসের ঘ্রাণ।

জাহাজি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে একটু তাকিয়ে থাকে। তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, এইটাই। সেটারও দরজা এরকম চামচিকের মতো শব্দ করত।

জাহাজি শ্বাস ছাড়ে। বলে, মেট, চলল। দেখা যাক।

দু'জনে সিড়ি ভাঙতে থাকে। সিড়ি যতই ওপরে উঠেছে ততই আরও অন্ধকার, পিছল পিছল, ধাপ তত উঁচু উঁচু। ক্রমান্বয়ে চুনবালি খসে পড়ার একটা ঝিরঝির ঝুরঝুর শব্দ হতে কে। মুখে গায়ে ঝাপটা মেরে উড়ে যায় চামচিকে। টিকটিকি ডাকে।

ক'তলায়?-গৌর জিজ্ঞেস করে।

দশ তলায়। আমার মনে আছে।

গৌর অবাক হয়ে বলে, কিন্তু এ বাড়িটা তো মোটে চার-পাঁচ তলা।

ঠিক বলছ?

ঠিক। এ কলকাতার পুরনো বাড়ি, চুন-সুরকির গাঁথুনি, এর ওপর দশ তলা হয় না।

তাহলে! বলে জাহাজিটা নাক চুলকোতে চুলকোতে ভাবে। বলে, তাহলে ক'তলায়! ঠিক মনে পড়ছে না তো!

চারদিকে নিস্তব্ধতা। ঝিঝি হঠাৎ ডেকে উঠে আরও নিস্তব্ধ করে দিতে থাকে। চুনবালি খসছে ততা খসছেই। ঝিরঝির ঝুরঝুর। বাইরে পরিরা নামছে এখন। কিন্তু এখানে, বাড়িটার ভিতরে কেবল হাজার বছরের অন্ধকার। হাজার বছরের জমে থাকা ধুলোব গন্ধ।

দু' জনে আবার সিঁড়ি ভাঙে। পলেস্তারা খসে, চুনবালি পড়ে সিড়িতে পুরু আস্তরণ। পায়ে লেগে ঢেলা গড়িয়ে পড়ে। ইদুরের নরম পা তাদের পায়ের পাতা ছুঁয়ে দৌড়ে যায়। মুখে গায়ে লেগে মাকড়সার জাল ছিড়ে যাচ্ছে। সারা বাড়ি জুড়ে সেই মিহিন পতনের শব্দ। ঝিরঝির ঝুরঝুর। আপনা থেকেই বাড়িটা অবিরল ক্ষয়ে যাচ্ছে। দরজা জানলা হা-হা করছে খোলা। বেশির ভাগেরই পাল্লা নেই। দু'এক জায়গায় বাঁশের ঠেকনা দাড় করানো আছে। জাহাজিটা ভালুকের মতো ঘরে দোরে ঢুকে দেখে। চারদিক খুঁজে বেড়ায়। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে কুকুরের মতো মুখ তুলে বাতাস শোকে।

কোনও ঘরেই নেই খাট পালং, টেবিল চেয়ার, আলমারি। কিছু নেই। দু'একটা কৌটোবাইটো পায়ে লেগে শব্দ করে গড়িয়ে যায়। একটা শিশি পড়ে ভেঙে গেল।

মেট!

উম।

এই বাড়িটাই। এইখানে সু থাকত। এইসব ঘর আমার চেনা।

আবার তারা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠে। ওপরে আবর্জনা বেশি। ইটের স্তূপ পড়ে আছে। ইদুর চামচিকে আরশোলা ঝিঝি অবিরল নানারকম শব্দ করতে থাকে। তারা এ ঘর থেকে ও ঘরে যায়। ঘরের পর ঘর দেখতে থাকে। এক-একবার এক-একটা জানালা দিয়ে বুকে দেখে জাহাজি। মাথা নেড়ে বলে, এ ঘর নয়। এখান থেকে লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন দেখা যায় না তো! অন্য ঘরে চলো মেট। যে ঘর থেকে সবুজ নিয়োন সাইনে দেখা যাবে, তুমি চাও লায়লার রুটি, সেইটাই স্যুর ঘর। প্রথমে জ্বলবে তুমি', তারপর 'চাও', তারপর লায়লার', সবশেষে 'রুটি।

অন্ধকার ঘরে, প্যাসেজে, বারান্দায়, প্যানট্রিতে তারা বার বার হোঁচট খায়। ডেব্রিসের ওপর হাঁটু ভেঙে যায়। আরও বাঁশের ঠেকনা, ডেব্রিস, ইটের ভূপ তারা চারদিকে টের পায়। বার বার দেশলাই জ্বালে জাহাজি। চারদিকে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির জরা স্নান ছবির মতো জেগে উঠে মিলিয়ে যায়। পোড়া কাঠি ছুঁড়ে ফেলে জাহাজি মাথা নাড়ে, না, এ ঘরটা নয়। কিন্তু এই বাড়িতেই ঘরটা আছে মেট। অনেকটা এইসব ঘরের মতোই। সু তো কালো ছিল, ভীষণ কালো। বাতি নিভিয়ে যখনই সে লুকোত তখন অন্ধকারে তাকে কোথাও খুঁজে পেতাম না। বাইরে তখন বার বার জ্বলে উঠত, তুমি চাও...তুমি চাও...তুমি চাও...লায়লার...লায়লার...রুটি। সবুজ আলোয় ঝলসে ঝলসে উঠত ঘর, কিন্তু সেই আলোতে ঠিক গায়ের রং মিলিয়ে লুকিয়ে থাকত সে। কিন্তু তার গায়ে একটা সুগন্ধ ছিল। সেই গন্ধটা ঘর ভরে থাকত। আমি সেই গন্ধ শুকে এঁকে চারধারে খুঁজতাম। ধরি ধরি করেও, কাছাকাছি গিয়েও ছুঁতে ধরতে পারতাম না। পালিয়ে যেত। তখন আবার পাগলের মতো খুঁজতাম। বাইরে তখন সবুজ আলো দপদপিয়ে উঠত, তুমি চাও...তুমি চাও...তুমি চাও...এইরকম–ঠিক এইরকম ঘরে সেইসব দারুণ ঘটনা ঘটত।

প্রকাণ্ড পাঁজর-কাঁপানো শ্বাস ছাড়ে জাহাজি। বলে, বুঝলে মেট, বড্ড কালো ছিল স্য, কিন্তু মধুরঙের চুল ছিল তার। খয়েরি চোখ–

খয়েরি? অবাক হয় গৌর।

খয়েরি নয়?

দুর! বাদামি তো।

তবে তাই। জাহাজি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়।

আর ফরসা রং।

ঠিক আছে।

আর কালো চুল।

আই। জাহাজি বলে। বলেই শ্বাস ছাড়ে। দেশলাইয়ের কাঠি ধরায়। সেটা নিভে যেতে হতাশভাবে আবার মাথা নাড়ে।

আবার পুরনো পিছল অন্ধকার সিড়ি ভাঙে তারা। টের পায়, সেই অন্ধকারে এক আলাদা জগৎ রয়েছে। সে জগৎ মানুষের নয়। চামচিকে, আরশোলা, ইদুর, ঝিঝির। রয়েছে তাদের ভয়, খেলা, আত্মীয়তা। তারা নড়ে চড়ে, দৌড়ায়, ওড়ে, ডাকে। একটি বহু পুরনো বাতাস বাড়িটার ভিতরে এখনও রয়ে গেছে। তাতে একশো-দুশো বছর আগেকার মানুষের শ্বাস মিশে আছে। অবিরল বাড়িটার বিন্দু বিন্দু গুঁড়ো গুঁড়ো পতনের মিহিন শব্দ হয়। ঝিরঝির ঝুরঝুর। ক্ষয়, অবিরল ক্ষয়।

অন্ধকারে জাহাজি হঠাৎ লাফ দিয়ে দুই ধাপ সিড়ি উঠে যায়।

কর্কশ চাপা গলায় বলে, মেট, এইখানে একটা বন্ধ দরজা।

দরজা?

দরজা। দুটো পাল্লা বন্ধ।

অন্ধকারে গৌর কিছুই দেখে না। উঠে আসে। জাহাজি দেশলাই জ্বালতেই দেখা যায়, দুই মানুষ সমান উঁচু এক বিশাল, নিরেট, বিবর্ণ দরজা বন্ধ হয়ে আছে। জাহাজি হাতড়ে দরজাটা দেখে বলে, মেট, ভিতর থেকে বন্ধ।

এইটাই কি স্যু-র ঘর?

মনে হচ্ছে।

জাহাজি সাবধানে দরজায় টোকা দিয়ে বলে, কে আছ?

সাড়া নেই।

কে আছ?

সাড়া নেই।

জাহাজি ক্রমে ক্রমে জোরে, আরও জোবে কড়া নাড়তে থাকে।

কে আছ? কে আছ? কে আছ?

প্রকাণ্ড পুরনো বাড়িটা তার স্বর শুষে নিয়ে আবার নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কেবল চামচিকের ডানা নড়ে। টিকটিকি হঠাৎ ডেকে ওঠে। অলক্ষে চুনবালি খসে পড়ার শব্দ হয়। ক্ষয়ের শব্দ। পতনের।

জাহাজি দরজায় কান পেতে ভিতরের শব্দ শোনার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরে। শোনে। দেয়ালে হেলান দিয়ে গৌরহরি একটা রথম্যান ধরায়। ঘুমে চোখ তুলে

আসে। চোখের সামনে রঙিন ডানাওয়ালা পরিরা ভেসে ওঠে। গৌর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুলতে থাকে।

মেট!

উম।

ঘরের ভিতরে শ্বাস ফেলার শব্দ হচ্ছে।

অ্যাঁ!

কেউ আছে। শোনো।

গৌর কান পাতে। বহুকালের পুরনো কাঠের দরজাব গন্ধ পায় গৌর। ভারী কাঠের, পুরু পাল্লার দরজা। গৌর কোনও শব্দ পায় না। সে কান পেতে কেবল অবিরল বাড়িটার ক্ষয়ের শব্দ পায়। চামচিকের ডানা বাতাস কাটে। টিকটিকি ডাকে। আরশোলা ফর ফর করে উড়ে যায়।

কোথায় শব্দ?

মন দিয়ে শোনো। খুব লম্বা টানা শ্বাস। শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠে ভেঙে যাচ্ছে। বুকের একটা ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। বড় কষ্টের খাস। শুনতে পাচ্ছ না?

না।

জাহাজি আবার কান পেতে শোনে। তারপর অন্ধকারে তার অস্পষ্ট মুখখানা গৌরের মুখের কাছে এগিয়ে এনে ফিসফিস করে বলে, মেট, এই ঘরে কেউ মারা যাচ্ছে।

অ্যাঁ?

এই শব্দ আমি চিনি।

গৌরের নেশা ধাক্কা খায়। টলমল করে মাথা। সে হাত বাড়িয়ে দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, কী বলছ?

এখানে কেউ মারা যাচ্ছে। নিরিবিলি, নির্জন এইখানে একা একা একজন মারা যাচ্ছে। খুব কষ্টের। খাস। বুকের শব্দ। মরবার আগে ঠিক এইরকম খাস ওঠে। উঠতে উঠতে ভেঙে ভেঙে যায়।

তাহলে?– গৌর তার রথম্যানে টান দেয়। তারপর কাশে।

চুপ!-জাহাজি ধমক দিয়ে চাপা গলায় বলে, ডিসটার্ব কোরো না।

কাকে?

যে মরছে, তাকে। সারাজীবন কত দুঃখকষ্ট মানুষের, কত খোঁজা, কত না-পাওয়া। বোধহয় অনেক শোকতাপ পেয়েছে। আহা! এতদিনে একটু সময় পেয়েছে মরার। একা একা, অন্ধকারে, নির্জনে আরামে মরছে এখন। ডিসটার্ব কোরো না। অতিথি এসেছে বুঝতে পারলেও তার পক্ষে উঠে এসে দরজা খোলা ভারী বিশ্রী ব্যাপার। মবার সময়টায় কাউকে বিরক্ত করা ঠিক না।

তারা চুপ করে শোনার চেষ্টা করে। গৌর কেবল বাইরে বাতাসে শুকনো পাতা গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ পায়। আর পোকা-মাকড়, পাখিদের শব্দ। আর ক্ষয়ের শব্দ।

জাহাজি দেশলাই জ্বালে। সেই ম্লান আলোয় তার মুখখানা বড় বিবর্ণ দেখে গৌর। জাহাজি ফিসফিস করে বলে, এই ঘরের জানালা থেকেই দেখা যাবে, তুমি চাও লায়লার রুটি'। এই ঘরেই স্যু রয়েছে মেট।

গৌরের শিরদাঁড়া বেয়ে সাপ নেমে যায়। গায়ের রোমকূপ শিউরে ওঠে। শীত করে তার।

সে স্খলিত গলায় বলে, স্যু?

স্যু।

জাহাজি আবার দেশলাই জ্বালে। আগুনটা জ্বলে উঠতেই জাহাজির দিশেহারা মুখ দেখতে পায় গৌর। কাঠিটা কাঁপতে কাঁপতে জ্বলে। আস্তে আস্তে কালো হয়ে কুঁকড়ে আসতে থাকে। আগুন সরে এসে জাহাজির আঙুল হেঁয়। দিশেহারা মুখখানা আবার অন্ধকার গ্রাস করে নেয়। কোনওখানে আলো নেই। তবু গৌর মনশ্চক্ষে দেখে একটা সবুজ আললা দপ করে জ্বলে উঠল। তাতে লেখা–তুমি চাও...।

প্রকাণ্ড ভারী দরজায় হেলান দিয়ে জাহাজি দাঁড়িয়ে। গৌর হাত বাড়িয়ে তার কাধটা ধরে।

কিন্তু সেই নিয়োন সাইনটা কোথায়? সেটা তো দেখা যাবে!

জাহাজি শ্বাস ছেড়ে বলে, কোথাও নেই। কেবল ওই ঘর থেকে দেখা যায়।

মাতাল। গৌর হাসে। বলে, চলো তো দেখি।

অন্ধকারে তারা দু'জন হাতড়ে হাতড়ে ঘুরে বেড়ায়। পাশের ঘরগুলো অন্য সব ঘরের মতোই ফাকা, চুন সুরকির তূপ পড়ে আছে। বাঁশের ঠেকনা রুজু রুজু দাঁড়িয়ে। তার ভিতর দিয়ে পথ করে করে তারা এ জানালায় ও জানালায় উঁকি মেরে দেখে। গাছের ডাল, ল্যাম্পপোস্ট, ঘুমন্ত বাড়ি, নিঝঝুম রাস্তা দেখা যায়। কোথাও নেই তুমি চাও লায়লার রুটি'র সেই সবুজ আলোর বিজ্ঞাপন। নেই, তবু গৌরের মনে হতে থাকে, আছে। কোথাও না কোথাও আছে। বাস্তবিক, বাজারে লায়লার রুটি নামে কোনও রুটি পাওয়া যায় কি না সে জানে না। ওরকম নিয়োন সাইনও তার চোখে পড়েনি। তবু মনে হয়, আছে। সে দেখেছে। বোধহয় স্বপ্নে। ঠিক ওই রকম একের পর এক সবুজ আলোর বান–তুমি...চাও...লায়লার...রুটি। ওই কথা কটি যেন পৃথিবীর বাইরের কোনও জগৎ থেকে ভেসে আসে। লোভ দেখায়। স্বপ্নে জাগরণে কেবলই তার অলীক নিমন্ত্রণ। মানুষের

ভিতরে কানায় কানায় উথাল-পাথাল ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে লায়লার রুটি। মানুষ দু'হাত বাড়িয়ে চায়, তখন কোথায় মিলিয়ে যায় সবুজ অলৌকিক নিয়োন সাইন।

কষ্টেসৃষ্টে তারা আরও এক তলা ওঠে। সিঁড়ি কোথাও কোথাও ভাঙা, রেলিং ভেঙে পড়েছে, অন্ধকার। তবু তারা ওঠে। নিয়োন সাইনটা খোঁজার জন্য। আছে, কোথাও আছে ঠিক। কিন্তু উঠতে কষ্ট হয় খুব। আবর্জনার তূপ জমে আছে। কড়ি বরগা পড়ে আছে চারদিকে। আলটপকা বেরিয়ে থাকা লোহার শিক গায়ে খোঁচা মারে। বাঁশের ঠেকনোতে তারা ধাক্কা খায়।

ওপরে হাঁ হাঁ দরজার সব ঘর। আবর্জনা প্রচুর। পা দিতেই ধুলো ওড়ে। পা হড়কায়। ধুলোয় কোথাও বা পা ডুবে যায়। কিন্তু এখানে অন্ধকার তেমন জমাট নয়। ফিকে। একটা অপার্থিব হলদে আলোর আভা চারদিকে, ভারী অবাক হয় তারা। হলুদ আলোয় নানারকম ছায়া পড়েছে। তারা আবর্জনার স্তুপ পার হয়ে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। জানালায় জানালায় লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন খোঁজে, পায় না। হলুদ আলোয় নিজেদের মুখ দেখে তারা।

গৌর হঠাৎ মুখ তুলে ভারী চমকে যায়। কী সুন্দর ছাদ! কী প্রকাণ্ড! তাতে চুমকি বসানো। একটা হলুদ আলোর ডুম জ্বলছে একধারে। কারা যেন ডুমটাকে ভারী অদ্ভুতভাবে ফিট করেছে দেয়ালে। বড় ভাল লাগে গৌরের। আরে বাঃ! দিব্যি ঘর। জাহাজিও হাঁ করে ছাদটাকে অনেকক্ষণ দেখে।

কয়েক পলক সময় লাগে ব্যাপারটা বুঝতে।

কী সুন্দর সিলিং! গৌর বলে।

উম।

ডুম জ্বলছে।

জাহাজি শ্বাস ফেলে বলে, ওটা সিলিং নয় মেট।

তবে?

জাহাজি বিষন্ন গলায় বলে, ওটা আকাশ। ওর ওপর আর কোনও তলা নেই।

গৌর তখন বুঝতে পারে। ঠিক। মাথার ওপর ওটা আকাশই বটে। ছাদটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। চারদিকে কড়ি বরগা শোয়ানো। বাড়িটা এখানেই শেষ।

চাঁদের আলোয় তারা ছাদহীন ঘরগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে। আকাশের একধারে বেশ্যার চোখের মতো কালি ঢালা গাঢ় কালোর মধ্যে বিবর্ণ মণির চোখ ওই চাঁদ। শেষে জ্যোৎস্না ঢেলে দিচ্ছে। সোনার গুঁড়োর মতো চারদিকে জ্যোৎস্নার ধুলো ওড়ে। পরিদের আবার দেখতে পায় গৌর। ফিনফিনে শিফনের পাখায় উড়ে যাচ্ছে। তাদের ছায়া পড়ে না। জ্যোৎস্নাময় শরীর। ‘ওড়ো বাবারা, ওড়ো’–সে বিড়বিড় করে বলে।

জাহাজি তার হাত ধরে, মেট, একমাত্র সু-র ঘর থেকেই দেখা যায় লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন। আর কোথাও ওই বিজ্ঞাপন নেই। কিন্তু সর ঘরে তো ঢোকা যাবে না। এখন, মরে যাওয়ার সুন্দর সময়ে সে কিছুতেই এসে দরজা খুলবে না। টুনাইট শি উইল এন্টারটেন ওনলি ওয়ান গেস্ট। ডেথ।

বাড়িটা খুবই উঁচু। গাই গাঁই গঙ্গার হাওয়ায় দমকা ধুলোবালি উড়ে আসে। চোখ কির কির করে, মাথার চুলে আটকে থাকে। হাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বগলুর পোলা গৌরা, অর্থাৎ কিনা বগলাপতির ব্যাটা গৌরহরির দম আটকে আসতে থাকে। ডেথ’ কথাটাই বাতাস হয়ে নাকের ফুটো দিয়ে ঢুকে ফুসফুস বেলুনের মতো ফুলিয়ে ফাটিয়ে দিতে চায়। কষ্ট হয় গৌরের। চাঁদের নীচে হঠাৎ মেঘ ডেকে ওঠে। বিদ্যুৎ চমকায়।

তারা বেভুল ঘুরতে ঘুরতে সিড়ির দরজায় আসে। তারপর অন্ধকার সিড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে থাকে। বন্ধ দরজার সামনে তারা একটু দাঁড়ায়। স্বপনের ঘর। দরজা খুললেই একটা অন্য জগতে চলে যাওয়া যেত। যেখানে রয়েছে স্য, জাহাজিকে যে

একদিন অলৌকিক জ্যোৎস্না খাইয়েছিল। আর রয়েছে সবুজ আলোর অপার্থিব বিজ্ঞাপন, তুমি চাও লায়লার রুটি। পৃথিবীর আর কোনও ঘরের জানলা থেকে যা দেখা যাবে না। ঘরের মধ্যে সুর গায়ের সুগন্ধ। সেই সুগন্ধের রেশ ধরে এসেছে এক হিম বাতাস। ভাঙা দীর্ঘ কয়েকটি খাস শেষবারের মতো টানছে স্য, অন্ধকারে একা।

জাহাজি দরজায় একটুক্ষণ কান পাতে। তারপর শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ে, বিরক্ত করা ঠিক হবে না। চলো মেট।

সিড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে তারা নামতে থাকে। অন্ধকার ধুলোর গন্ধ। চামচিকে, ঝিঝি, ইদুর, আরশোলার শব্দ। আর সব শব্দের আড়ালে অবিরল এক মিহিন পতনের শব্দ শোনে গৌর। ক্ষয়ের শব্দ। ঝিরঝির ঝুরঝুর।

ফাঁকা কপাটহীন জানালা দরজা দিয়ে এক ঠান্ডা ঝোড়ো বাতাস হুড় দৌড় করে ঢোকে। ধুলো উড়তে থাকে। দুইজন দীর্ঘ অন্ধকার সিড়ি বেয়ে নামতে থাকে।

বাইরে এসে তারা দেখতে পায়, জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি পড়ছে। কী উল্লাস বৃষ্টির! চারদিকে। জলে মাটিতে প্রবল ভালবাসার চিৎকার ওঠে। জুড়িয়ে যাচ্ছে ভাপ। বৃষ্টি ভেদ করে ক্ষয়া চাদের আললা মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে। চরাচর জুড়ে দৌড়চ্ছে বৃষ্টির পা। অপার্থিব শিশু-পরিরা ধুয়ে মুছে গেছে। মেঘ ডাকে। পুরনো বাড়ির ভিত কেঁপে ওঠে। গুরগুর করে বাড়িটার বুক। অন্ধকারে তার অবিরল ক্ষয় চলেছে। মেঘের ডাকে তার আলগা পলেস্তারাগুলো খসে পড়ে। মৃত্যুভয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে সে।

তারা দু'জন দরজায় দাঁড়িয়ে সেই জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি দেখে। তারপর জাহাজি হাত বাড়িয়ে গৌরের শুখো হাতখানা ধরে আত্মীয়ের মতো বলে, চলো মেট।

গৌর ঘাড় নাড়ে।

ল্যান্ডমাস্টারটা গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে ভিজছে। লোকে যেমন গৃহপালিতের গায়ে হাত রাখে তেমনি আদরে গৌর ল্যান্ডমাস্টারের বনেটে একটা চাপড় দিয়ে বলে, চল বাবা ল্যাভু।

গভীর বৃষ্টির অভ্যন্তরে চলে যেতে থাকে তারা। রাস্তা কিছুই চেনা যায় না। পুরনো কলকাতা ধুয়ে গলে গেছে। তার বদলে মাঝরাতের বৃষ্টির ঝরোখা ভেদ করে এক অপরূপ কল্পনার শহর ফুটে ওঠে উইন্ডস্ক্রিনো চাদের হলুদ আলল, টিমটিমে ল্যাম্পপোস্ট, গাছের ছায়া, রাস্তার জল থেকে বিচ্ছুরিত আলো, বৃষ্টির ফোঁটায় আলোর বিন্দুর দ্রুত সরে যাওয়া। ঝিলমিলে অস্পষ্ট এক শহরের ভিতর দিয়ে জল ঠেলে চলে গৌরের ল্যান্ডমাস্টার, ওয়াইপারের কাটা দুটো পাগলের মতো নড়ে। তবু জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টির তীব্র ফোঁটাগুলো গভীর আবেগে এসে ফাটে কাচের ওপর। গৌর চোখে তেমন দেখে না। দু'জনের ভেজা শরীরে বাতাস লাগে। চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে। গাড়ির কাচ তোলা, বদ্ধ বাতাসে তাদের শ্বাসের ভাপ জমতে থাকে কাচের গায়ে।

গৌরের গাড়ি বড় আনন্দে অচেনা শহরটাকে ফঁকা রাস্তায় চক্কর মেরে ফিরতে থাকে। কিন্তু ক্রমে শহরের বাড়িঘর ফুরিয়ে যেতে থাকে। গাড়িটা একটা ফাঁকা জায়গায় চলে আসে। সামনে বিপুল বিস্তৃত অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ছোট্ট ছোট্ট ফুটোর মতো কয়েকটা আলো। বৃষ্টির তীব্র শব্দ উইন্ডস্ক্রিন ফাটিয়ে দেয়। গৌর হাত দিয়ে কাচ মুছে ভাল করে সামনেটা দেখে। ঠিক বুঝতে পারে না, এটা কোন জায়গা। মনে হয়, একটা বিশাল মাঠ সামনে।

ল্যান্ডমাস্টার, ঘড় ঘড় করে। ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানার মতো শব্দ হয়। তারপর কাশির শব্দ করে ল্যান্ডমাস্টার। গৌর একটু ঝুঁকে সামনে হঠাৎ দেখতে পায়, বিশাল সাদা একটা বাড়ি। চারদিকে ঘোর অন্ধকার। তবু বাড়িটা আবছায়ায় ঠিকই দেখতে পায় গৌর। বাড়ির চারদিকে বিরাট বাগান।

ল্যান্ডমাস্টারটার সব শব্দ হঠাৎ থেমে যায়। নিঃশব্দে গাড়িটা গড়ায় খানিক।

শালা!- গৌর বলে।

কী?– জাহাজি ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে।

শালার ল্যান্ডমাস্টারের তেল মরেছে।

জাহাজি উত্তর দেয় না। উইন্ডস্ক্রিনের ঝাপসা ভেদ করে প্রবল বৃষ্টির চিকের ভিতর দিয়ে সে সেই প্রকাণ্ড বাগান আর অস্পষ্ট বাড়িটা দেখছে।

মেট, ওই বাড়িটা আমার চেনা। আর ওই বাগান।

আমারও চেনা-চেনা লাগছে। কিন্তু ঠিক চিনতে পারছি না।

জাহাজি মুখ ফিরিয়ে বলে, ওই তো সেই বাগান যেখানে স আমাকে জ্যোৎস্না খাইয়েছিল।

অ্যাঁ!

জাহাজি মাথা নেড়ে বলে, ওই সেই ভিক্টোরিয়ার বাগান। চারদিকে অন্ধকার, তবু দেখো ওই বাগানে একটুখানি জ্যোৎস্না এখনও পড়ে আছে।

গৌর প্রাণপণে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই জ্যোৎস্না দেখতে পায় না। বলে, কোথায় জ্যোৎস্না?

জাহাজি গম্ভীর গলায় বলে, আছে মেট। আমার জন্য এখনও একটু জ্যোৎস্না রয়েছে। সবাই সবকিছু দেখতে পায় না।

জাহাজি হাতড়ে দরজার হাতল খোঁজে।

কোথায় যাবে?-গৌর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

জাহাজি বিড়বিড় করে বলে, ওই বাগানে আর একবার আমি যাব।

পাগল! যা বৃষ্টি!

জাহাজি মাথা দুলিয়ে বলে, জাহাজ ছেড়ে গেলে আর হয়তো ফেরা হবে না। পৃথিবী বড় বিশাল। হারিয়ে যাব। আর এই বাগান, এই জ্যোৎস্নায় আসা হবে না মেট। আমাকে নামিয়ে দাও।

গৌর হাত বাড়িয়ে লক খুলে দেয়। বড় মায়া হয় তার। আহা, দুঃখী জাহাজি যদি ওই বৃষ্টির ফঁকা বাগানে কিছু পেয়ে যায় তো যাক।

দরজা খুলতে খুলতে জাহাজি বিড়বিড় করে বলে, স্য...জ্যোৎস্না...সবুজ আলো...লায়লার রুটি...

বলতে বলতে নেমে যায় জাহাজি। মুহূর্তে বৃষ্টির ঝরোখা ঢেকে নেয় তাকে। অন্ধকার ডাকে। বিদ্যুতের চমক, বাতাস, প্রকাণ্ড বাগানের বিস্তার ছোট্ট একা মানুষটাকে গ্রাস করে নেয়।

হুড় হাওয়া দেয়। উড়ে আসে তীব্র বৃষ্টির ফোটা। সব ওলট-পালট করে দিয়ে যাচ্ছে। পাল্টে দিচ্ছে শহর। বদলে দিচ্ছে মানুষের মন। চেনা চারদিকে অচেনা জগতের ছবি ফুটিয়ে তুলছে। গৌর অস্পষ্ট চোখে এইসব দেখে। বিদ্যুৎ চমকায়। গৌর আবছায়া ভেদ করে ঘুমের আঁষ-জড়ানো চোখে, জাহাজি বেড়ালের মতো লাফ দিয়ে উঠে দেয়াল ডিঙিয়ে বাগানের ভিতরে নেমে গেল।

চারটে দরজাই ভাল করে লক করে গৌর। হাই তোলে। পরিদের আর দেখা যাচ্ছে না। গৌর সামনের সিটে তার দুটো রুখে-শুখো হাত-পা গুটিয়ে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়ে।

তারপর বগলুর তিন নম্বর, হাফ-ফিনিশ ফিফটি পারসেন্ট গৌর বড় আরামে ঘুমোতে থাকে।

২. পৃথিবীটা বড় ম্লান

পৃথিবীটা আবার বড় ম্লান, রংচটা, ধুলোটে লাগে গৌরের। যখন চড়চড়ে রোদ দেয়, ঘামে আঠা-আঠা করে শরীরে, তখন কলকাতার এধারের সোয়ারি ওধারে করতে করতে গৌরের মাঝে মাঝে লায়লার রুটির কথা মনে পড়ে। সেই সবুজ ঘর, স্যু, জ্যোৎস্না, সেই জাহাজি। কিন্তু কিছুই সত্য বলে মনে হয় না। বগলুর তিন নম্বরের ওইটাই মুশকিল। ড্রিম আর রিয়্যালিটির অ্যাডমিকশ্চার। কোনটা ড্রিম, কোনটা রিয়্যালিটি তা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না সে।

হাওড়া স্টেশনের গাড্ডায় ঢুকলে পুলিশের বিশ পয়সা। পুলিশ হাতে নেয় না। ছোকরা আছে। ছোকরারা দাপটে পুলিশের বাবা। কাট মারার চেষ্টা করলে এক চোখ ছোট করে, আঙুল তুলে নম্বর ধরে ডাকে। বিশ পয়সার দশ পুলিসের, দশ ছছাকরাদের। বে-লাইনে সোয়ারি নিলে একটাকা। হাওড়া স্টেশনের গাজায় কখনও আসতে চায় না গৌর, ব্রিজ পার হওয়া বড় ঝামেলা। তার ওপর সোয়ারির লাইন, পুলিশ, ছোকরা, তারপর সবার বাবা জ্যাম। তবু আজ এসে যেতে হল। দুপুরে কালীঘাটের গলিতে পাঞ্জাবি হোটেলে খেয়েছে, শেষপাত টক দই। খেয়ে ঝিমোচ্ছিল গৌর। পাশেই একটা লটারির গাড়ি মেলাই চিল্লাচ্ছিল। ওদের মাইক্রোফোনটা ঘ্যার-ঘারে। ইউ-পি লটারির শেষ তিনদিন নিয়ে বিস্তর কান্নাকাটি করল। সেই সময়ে ভাতঘুমে একটা ভাল স্বপ্ন দেখে উঠে গৌরের মনে হল, পৃথিবী জায়গাটা ভালই। সে তখন দরজা খুলে নেমে গিয়ে লটারির গাড়িটার কাছ থেকে একটা টিকিট কেনে। হরিয়ানা এবার পনেরো লাখ দিচ্ছে। গাড়িতে বসে নিরিবিলিতে অনেকক্ষণ টিকিটের ছবি দেখেছিল গৌর, অর্থাৎ কিনা গৌরহরি, বগলাপতির তিন নম্বর। সেকেন্ড প্রাইজ মোটে এক লাখ। গৌর ঠোঁট বেঁকায়। পেলে ওই পনেরো লাখ। পনেরো লাখে জাহাজ কেনা যায়। সেই তুলনায় এক লাখ বড়ই গরিবিয়ানা।

সেই লটারির ছবি দেখার সময়েই একজোড়া বুড়োবুড়ি হামলে এসে পড়ল, ও বাবা, কোনও গাড়িই যে ইস্টিশনে যাচ্ছে না! আর দেরি হলে যে আমরা কাটোয়ার গাড়ি ধরতে পারব না।

হাওড়া যাবে না গাড়ি।

বুড়িটাই উথলে ওঠে, ও বাবা, কলকাতা তো তোমাদেরই শহর। আমরা মফস্সলের লোক। রাস্তাটা পার করে দাও বাবা, তোমাদের ভাল হবে।

আড়চোখে গৌর দেখল, সঙ্গে নাতি, বুড়ো, আর বিস্তর পোটলা-পুঁটলি। দশ-বারো বছরের নাতিটার হাতে একটা নতুন বালতি, আর তোলা উনুন। বুড়োর এক হাতে পেটা লোহার কড়াই, অন্য হাতে ডালের কাটা, খুন্তি, কুয়োর বালতি তোলার হুক। বুড়ির হাতে কয়েকটা পট, আঁতা,নতুন বেডকভারের পুটলি থেকে উকি দিচ্ছে গঙ্গাজলের বোতল। এই বয়সে নতুন সংসার পাতার কথা নয়। তাহলে বোধহয় কালীঘাটের জিনিস কিনে নিয়ে পাঁচজনকে দেখানো হবে। গৌর আবার টিকিট দেখে।

ও বাবা, আমরা পয়সা দেব। ফাঁকি যাবে না।

ট্যাক্সির কী দরকার! বাসে চলে যান।

উঠতে দিচ্ছে না যে! যা ভিড়। বাবা গো, নিয়ে চল।

গাড্ডা। গৌর শ্বাস ফেলে দরজা খুলে দেয়। তিনজন ভারী খুশি হয়ে গাড়িতে ওঠে। গাড়ি ছাড়তে বুড়ি হাত বাড়িয়ে শালপাতার ঠোঙায় সিদুরমাখা পাঁড়া প্রসাদ দিয়েছে, জবাফুল, আর একটা কমলালেবু। সেসব এখনও গৌরের সিটে পড়ে রয়েছে। কাটোয়ার গাড়ি পেয়ে গেছে ওরা।

বেলাইনে গাড়ি ঢোকায় গৌর। একটা টাকার মামলা। বেরিয়ে এসে আড়মোড়া ভেঙে স্টেশনের ঘড়িটা দেখে। ফরসা চাদরের মতো ধবধবে রোদ পড়ে আছে। ঘড়িতে মোটে

একটা। বেলাইনে আরও কয়েকটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে একটা গৌরের চেনা। গৌর একটু এগোতেই মলিনকে দেখতে পায়। সিটে দুই পা তোলা, ঠোঁটে ভেজা সিগারেট, হাতে বই, মলিন বসে আছে। কোনওদিকে খেয়াল নেই।

গৌর বলে, মামু!

মলিন মুখ তুলে হাসে, কী বে ত্রিভঙ্গমুরারী, কী খবর?

খবর নেই। তোমার খবর বলো।

মলিন উদাস গলায় বলে, তোমার সাউথে গ্যারেজ, আরামে আছে।

আরাম কীসের?

মলিন হাসে, বেশ্যা আর ব্যাপারিদের গা আর বগলের গন্ধ শুকতে হয় না আমার মতো। এই মাত্তর একবোঝা বিড়ির পাতা খালাস দিলাম। তোমার গাড়িতে যারা ওঠে তারা আতরের গন্ধ রেখে যায়।

গৌর হাসে, এখনও সোনাগাছিতে কমলার বাবু ধরে দিচ্ছ নাকি?

মলিন উদাস গলায় বলে, দিই। গাড়ির যেমন সোয়ারি দরকার তেমনি ওদেরও। নর্থের গলিখুঁজিতে ঘুরলে না তো, তাই তোমার চুল পাকেনি। তা সাউথে বৃষ্টিবাদলা কেমন? আর মেয়েমানুষ?

গৌর বলে, কী যে বলো!

মলিনের মুখের আটক কোনওকালে নেই। ওর ট্যাক্সিখানা গৌরের মতো হরবখত যেমন-তেমন পাবলিককে তোলে না। বেছে বেছে তোলে। দু'হাতে পুলিশকে পয়সা দেয় মলিন, আবার দু'হাতে ললাটে। বলতে গেলে, সারা দিনমান গাড়িখানা গ্যারেজেই থাকে, বেরোয় বিকেলের পর। জায়গা বেছে পঁোড়ায় বড় হোটেলের তলায়, মাতালদের পৌঁছে দেয়।

শনিবারে বাঁধা রেসের ময়দান। সেখানে শেয়ারের পান্টদের তোলে। মাসে তিরিশদিন পুলিস তার লাইসেন্স কেড়ে নেয়। তিরিশদিন ফেরত দেয়। হাড়কাটার মতিয়া কখনও কখনও মলিনের গাড়িখানা ভাড়া নেয় সারা বিকেলের জন্য। ময়দানের কাছাকাছি নির্জনে গাড়ি দাড় করিয়ে মলিন নেমে গিয়ে ঘাসে শুয়ে থাকে। মলিনের গাড়ি তখন মতিয়ার ঘর হয়ে যায়। বাবু আর মতিয়া থাকে কেবল। আর থাকে। গঙ্গার হাওয়া। থাকে জ্বালা-যন্ত্রণা। টাকা ওড়ে।

মতিয়া বড় সুন্দর। এত সুন্দর গৌর কদাচিৎ দেখেছে। থোপা থোপা লালচে চুল, নরম মুখ, রোগাটে শরীর, আর কী গম্ভীর চোখ। তাকে একবার পৌছে দিয়েছিল গৌর। সেদিন মলিনের গাড়ি ছিল খারাপ। গৌরের বুক খুব কেঁপেছিল। মতিয়া কিন্তু একবারও দেখেনি কে গাড়ি চালাচ্ছে। একটা রুখখা-শুখো হাত-পাওয়ালা দুঃখী লোক গৌর, গৌরা, বগলুর ছাওয়াল, সময়মতো পোলিও আর টাইফয়েড না ধরলে যে বিলেত চলে যেত, হয়তো বিয়ে করত মেম। এতদিনে কত কী হয়ে যেত গৌর! মতিয়া সেই গৌরকে দেখেইনি। ট্যাক্সিওয়ালা ভেবে ভ্রুক্ষেপ না করে নেমে গেল হাড়কাটা গলির ভিতরে এক বাড়ির সামনে। চাকর এসে টাকা দিয়ে গেল। মতিয়ার সঙ্গে পাবলিকের কারবার নেই, গৌর জানে। মতিয়া দরজায় দাঁড়ায় না, ডাকে না, ইশারা করে না। তার ঘরে টেলিফোন আছে, সাদা শিশুকাঠের খাট আছে, ড্রেসিং টেবিল আছে, রেফ্রিজারেটারও। যেমন বাছাই তার জিনিসপত্র, তেমনই বাছাই তার পুরুষেরা। আজও গৌরের গাড়ির গদি শুকলে বোধহয় মাতিয়ার সেই দুর্লভ গন্ধটুকু পাওয়া যাবে।

মতিয়ার কথা ভাবতে গিয়ে একটু অন্যমনস্কতা এসে গিয়েছিল গৌরের। মলিন ডেকে বলে, তোমার ফাতনা নড়ছে গৌর, দেখো।

একটা লম্বা লোক কোলে একটা ফ্যাফ্যাতে বাচ্চা, সঙ্গে ফরসা বউ। তারা গৌরের গাড়ির হাতলে লক করা বলে দরজা খুলতে পারেনি, নইলে উঠে বসত। ভুখখা পার্টি, বালী কি রিষড়ে থেকে এসেছে। সিনেমায় যাবে হয়তো, কিংবা যাদবপুর কি বেহালার আত্মীয়বাড়ি। মাসে এক-দুই দিন বউ নিয়ে বেরোয়, তখন ট্যাক্সি চড়ে।

গৌর এগোয় না। দূর থেকেই হেঁকে বলে, গাড়ি যাবে না দাদা।

লোকটা একভিড় মানুষের মধ্যে ট্যাক্সিওয়ালাকেই খুঁজছিল। এখন গৌরকে দেখে মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, কেন?

গাড়ি খারাপ আছে। ইঞ্জিন গরম।

লোকটা কপালের ঘাম হাত দিয়ে কঁচিয়ে ফেলে। বউটার মুখের পাউডার ঘামে গলে যাচ্ছে।

লোকটা একবার মুখ তুলে স্টেশনের ঘড়িটা দেখে গৌরকে ধমকাবে না কাকুতি মিনতি করবে তা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বলে, বড় বিপদ ভাই। সোয়া একটা বেজে গেছে, দুটোয় পৌঁছতেই হবে।

লাইনে দাঁড়িয়ে যান না, পেয়ে যাবেন।

লোকটা শুকননা গলায় বলে, লাইনে দাঁড়ালে পঁচিশজনের পিছনে পড়ে যাব। অন্তত আধঘণ্টা। বড্ড বিপদ।

বিপদ! কার না বিপদ! কলকাতা-সুন্ধু মানুষ রাস্তায় দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে সারা দিনমান 'বিপদ, বিপদ'বলে চেঁচাচ্ছে। গৌরের গাড়ি কি দমকল না অ্যাম্বুলেন্স? তবু তো গৌর দাঁড়ায়, মলিন হলে? যেদিন, যেখানে তার গাড়ি যাচ্ছে, একমাত্র সেদিকের বা সেখানের সোয়ারি ছাড়া তুলবেই না। পুলিশ ডাকো, তম্বি করো, মলিন উত্তর দেবে না। পুলিশ লাইসেন্স কেড়ে নিলে শান্তভাবে দিয়ে দেবে। জানে, লাইসেন্স তার পোষ পাখির মতো। লোক-দেখানোর জন্য উড়ে যায়, আবার চোরাপথে ফিরে আসে। কার কী বিপদ তা নিয়ে মলিন মাথা ঘামায় না, রেসের বইটি খুলে ক্লাসে ফাস্ট-হওয়া ছাত্রের মতো মনোযোগ দিয়ে বইখানায় ডুবে যাবে। আর তখন ভুখখা পাটিদের পিজরাপোলে বৃথা টক্কর মেরে

গৌরের ল্যান্ডমাস্টারের আয়ুক্ষয় হয়। মতিয়ার গায়ের গন্ধটুকু লোকের গায়ের ঘষায় ঘষায় উঠে যাচ্ছে ক্রমে।

পারবে না গৌর। দূর থেকেই খেকিয়ে বলে, বলছি তো গাড়ি খারাপ আছে।

লোকটা নিরীহ, ভিতু ধরনের, বউটাও তাই। গৌরের ধমক খেয়ে এ ওর দিকে চায়। লোকটার গলা বেয়ে দারুণ ঘাম নামছে। বাচ্চাটা তার ছোট্ট মাথা তুলে চারদিকে চায়। রোদে লাল হয়ে গেছে মুখ।

গৌর মুখ ফিরিয়ে নেয়।

লোকটা দু'পা এগিয়ে এসে বলে, ওই গাড়ি কি যাবে?

মলিন মাথা নাড়ে, না দাদা, আমার বিয়ের পার্টি আছে।

লোকটা চারদিকে চায়। বাস লোক গাদাই হয়ে আছে। চারদিকে মেলার ভিড়। তোক যে কোথা থেকে আসে! কোথায় যায়!

কোনও দরকার ছিল না তবু মলিন জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন?

পি জি হাসপাতালে। মেয়েটির পোলিও ভ্যাকসিনের ডেট আজ। সেকেন্ড ডোজ। দুটোয় বন্ধ হয়ে যায়। সময়মতো ভ্যাকসিনটা না পড়লে কী হয় না হয়,

মলিন মোলায়েম গলায় বলে, বাসে চলে যান না। এখনও পৌনে একঘণ্টা সময় আছে, পৌছে যাবেন।

পোলিওর কথা শুনে গৌর থমকে গিয়েছিল। পোলিও! আই বাপ! ওই জিনিস না হলে কবে কলকাতা থেকে পাখি হয়ে যেত গৌর! প্রজাপতি হয়ে ঘুরে বেড়াত বিদেশের বাগানে। পোলিও না হলে গৌরের চারখানা পুরো হাত-পা, আর আত্মবিশ্বাস থাকত। হত

মেমবউ। বিলেতেই শিকড় চারিয়ে দিত সে। তার শিশুকালে দুনিয়ার নেমকহারাম মানুষেরা কেউ পোলিওর ভ্যাকসিন বের করেনি।

ঘড়িটা দেখে গৌর। মূল্যবান আরও পাঁচটা মিনিট কেটে গেছে। ব্রিজের শেষ মাথায়, বড়বাজারের গায়ে একটু জ্যাম আছে বটে। তবে ধীরে ধীরে চলছে গাড়ি। চল্লিশ মিনিট সময় আছে। পৌঁছে দিতে পারবে।

সে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়, উঠুন।

লোকটা বিশ্বাস করতে পারে না। বলে, উঠব?

বলছি তো।

তারা ওঠে। গঙ্গা পেরোতে বউটা ভারী খুশি গলায় বলে, কী সুন্দর গঙ্গার হাওয়া গো, কাচটা আর একটু নামিয়ে দাও না।

শালারা এতদিনে পোলিওর ভ্যাকসিন বের করেছে। গৌর একটা সিঙ্গাপুরি কলা-বোঝাই লরির পেছনে প্যাপোর-পোঁ হর্ন মারে। কলার পাহাড়ের ওপর বসে দুটো কুলি অনিচ্ছেয় একটার পর একটা কলা খেয়ে যায়। গাড়িটা নড়ে না। হারামির বাচ্চা। গাল দেয় গৌর। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

এতদিনে পোলিওর ভ্যাকসিন বেরিয়েছে। তা এতদিন কী করছিল মানুষ? হোয়াট বিজনেস?

গৌর ভারী বিরক্ত হয়। রুখে-শুখো দুটো হাত-পায়ের জন্য তার আবার দুঃখ হতে থাকে। একবার মুখ ফিরিয়ে বাচ্চাটাকে দেখে। টুলটুলে একটুখানি মুখ, ড্যাবা চোখে চারদিক দেখছে, মুখে আঙুল। থোপা থোপা চুল উড়ছে, নড়ছে হাওয়ায়। ভারী মায়া হয় গৌরের। বেঁচে থাকো। সব ক' টা হাত-পা নিয়ে, আস্ত মানুষ থাকে। পৃথিবীর অন্ধকার থেকে রোগ-ভোগ হাত বাড়ায়। সাবধান।

কলার গাড়িটা থেকে একটা কলার খোসা উড়ে এসে বনেটের ওপর পড়ে পিছলে যায়। গৌর একবার মাথাটা বের করে। কুলিটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অন্য সময় হলে গৌর অন্তত "শুয়োরের বাচ্চা' বলতই। এখন বলল না। ইচ্ছে করল না, মুখটা আবার ঢুকিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে গৌর।

জ্যামটা আস্তে আস্তে নড়ে। হাত-পা শিরশির করে গৌরের। দেরি হয়ে যাচ্ছে। বড় বেশি দেরি।

কুড়ি মিনিট লাগল ব্র্যাবোর্ন রোডের মোড়ে পৌঁছোতে। তারপর ঝড়ের মতো গাড়ি ছাড়ে গৌর। টেম্পো, ঠেলা, লরি মুহুর্মুহু কাটিয়ে যায়। গাড়ি টাল খায়, পিছনের সোয়ারি এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। গৌর সেসব খেয়াল করে না। গতির উত্তেজনায় বউটা বাচ্চার ভ্যাকসিনের কথা ভুলে গিয়ে বরের হাত চেপে ধরে ভয়-পাওয়া হাসি হেসে বলে, মাগো, কী জোর গাড়ি যাচ্ছে দেখো।

লোকটা কাঠ-কাঠ হাসে। শক্ত হয়ে বসে থাকে।

গৌর এক ঝটকায় ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট পেরোয়। তারপর ময়দানের ভিতর দিয়ে উড়িয়ে দেয়। গাড়ি। উড়োজাহাজের মতো গোঁ গোঁ শব্দ করে গাড়ি। ইঞ্জিন ধোঁয়ায়। গৌর দাঁতে দাঁত চেপে রাখে। জোরে গাড়ি ছাড়লে রাস্তাঘাট আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ময়দানে বড় খেলা আছে। বোধহয় মোহনবাগান আর মহামেডান। লোকজন রাস্তা পার হচ্ছে ময়দানমুখো। গৌর ভ্রুক্ষেপ করে না। গাড়িটা মানুষজনের ওপর ছুঁড়ে মারে যেন। সটাসট সরে যায়। গৌর হাসে।

গাড়ি ওড়ে। উড়তে থাকে। পিছনের সোয়ারিরা নিশ্চুপ হয়ে গেছে। বিভোর হয়ে গেছে। ময়দানের হাওয়া বুক ঝাঁঝরা করে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পোলিও! পোলিও! গৌর বিড়বিড় করে। গাড়িখানা বাঁকে ঘুরতে থাকে। একটুও গতি কমায় না গৌর! চালিয়ে দেয়।

ঘড়িতে তখনও দশ মিনিট বাকি, গৌর গাড়িখানা পি জি-র আউটডোরে ভিড়িয়ে দেয়। পয়সা দেওয়ার সময়ে ওরা স্বামী স্ত্রী অবাক চোখে গৌরকে দেখে কিছুক্ষণ। রুখখা-শুখো হাত-পা-ওলা। দুঃখী চেহারার লোকটা অত জোর গাড়ি চালাতে পারে! সম্ভবত তারা বহুকাল গৌরের গাড়িতে চড়ার রোমহর্ষক গল্প করবে মানুষের কাছে।

.

একা গাড়ি আর গৌর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে থাকে। চারটে বাজলে দাশ কেবিন। দক্ষিণের সোয়ারি পেলে ভাল। নইলে মিটার রইল ঢাকা, বনেট তোলা রইল। ফোটো পাবলিক। গাড়ি দক্ষিণ-মুখো দাড় করিয়ে গৌর ঝিমোয়। পাঁইয়ার হোটেলের দই ভাতের আমেজ ফিরে আসতে থাকে।

কিন্তু গৌরের জীবনে শান্তি নেই। মল-পরা একখানা পায়ের শব্দ ঝম করে বেজে ওঠে। মাইরি! এ কী! গৌর একটু চমকায়। খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা করলে তবে মাগিটা তার বেহদ্দ নাচ শুরু করে বটে মাথার ভিতরে। তারপর নানা কায়দায় নানান তালে নাচে। গৌরের জীবন খাট্টা করে ছেড়ে দেয়। পাগল-পাগল লাগে। কিন্তু এখন তো কোনও চিন্তা করেনি গৌর। না রাখোহরির কথা, না তার বাপ বগলুর কথা, তবে? গৌর আধখানা চোখ খোলে। পশ্চিমের রোদ কানকি মেরে চোখে আঙুল ঢোকায়। ঝলসানো হিজিবিজি দেখে সে। আবার চোখ বোজে। ঝমাঝম মলের শব্দ হয় আবার। গৌর আধা-জাগা অবস্থায় বড় করে শ্বাস ফেলে। মাগিটা কেন যে নাচে, নেচে তার কী বেহদ্দ সুখ, গৌর তা আজও বুঝল না। টাইফয়েডেরও ওষুধ বেরিয়ে গেছে। সে আমলে টাইফয়েড হয় পুরো মানুষ নিত, নয়তো নিত হাত-পা-চোখ কিংবা ওরকম কিছু। গৌরের মাথা নিয়েছিল। সেই থেকে মাথায় বেহদ্দ মাগিটা ঢুকে বসে আছে। বেরোবার নাম নেই। টাইফয়েডটা যদি তার হাত-পা নিতে চাইত তবে অনায়াসে পোলিওয় শুকিয়ে যাওয়া ফালতু হাত-পা দেখিয়ে দিত গৌর, বলত, এই দুটো নাও, কাজে লাগে না তেমন, পড়ে আছে।

গৌর চোখ খোলার চেষ্টা করে। অমনি আবার ঝমঝম পায়ের শব্দ বাজে। বাজতে থাকে। কিছুই করার থাকে না গৌরের। হাসপাতালের বাড়ির হাত দুয়েক ওপরে সূর্য। আউটডোরের বাইরে একটা কল থেকে ফালতু জল পড়ে যাচ্ছে। কিলবিল করে মা বাপ আর আয়ার সঙ্গে ঘুরছে রঙিন বাচ্চারা। খুব ভিড়। পোলিওর ভ্যাকসিন দেওয়া শেষ হয়ে এল। একটা বাচ্চা মা'র হাত থেকে ছুটে ওই কলের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। সবই ঠিকঠাক দেখতে পায় গৌর। কোনওখানে গোলমাল নেই। তবু আবার ঝমঝম শব্দ হয়। চকিতে গৌর ঘাড় ঘোরায়।

চোখে ঘুমের আঁষ জড়ানো। পিছনে কাচে ধুলো পড়েছে। গৌর অস্পষ্ট দেখতে পায়, পিছনের কাচের ওপাশ থেকে একটা দেহাতি মেয়ের মুখ জ্বলজ্বল করে তাকে দেখছে। তার পরনে বাহারি হলুদ শাড়ি, গায়ে রুপোর গয়না, নাকে বেসর। চোখে কাজল টেনেছে গভীর করে, চোখ দুখানা তাই বোধহয় অত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে গৌরের অস্বচ্ছ চোখে, ধুললাটে কাচের ওপারে মেয়েটাকে স্বপ্নের মতোই মনে হয়। মেয়েটা কাচের ওপর একখানা হাত পেতে রাখল। গৌর সেই হাতে মেহেদির নকশা দেখে।

কী চাই?-গৌর জিজ্ঞেস করে।

মেয়েটা এক-পা দু'-পা এগোয়। মলের শব্দ হয় ঝমঝম।

গাড়ি জায়েগি?

কঁহা?

পারক সারকাস।

গৌরের সন্দেহ হয়।

কিরায়া কৌন দেগা?

মেয়েটা হাত তুলে সঁতে আঙুল কামড়াল, তারপর মুখ ফিরিয়ে ফুটপাথের দিকটা দেখিয়ে বলল, উও।

ভঙ্গিটা বড় ভাল লাগে গৌরের। গৌর মুখ বাড়িয়ে দেখে, ফুটপাথে দেয়ালে ঢলে বসে আছে এক বুড়ি, তার সামনে রুপোর মোটা বালা-পরা হাত, বাসন্তী রঙের পাগড়ি মাথায় এক সুন্দর দেহাতি লোক বসে বুড়ির মুখে লোটা থেকে জল নিয়ে ঝাপটা দিচ্ছে।

কী হয়েছে?

বড্ড গরম ছে, দাঁতি লাগি।

ও তোমার কে হয়?

মেয়েটা উদাস মুখ করে বলে, শাস।

আর ওই লোকটা?

তেমনই উদাস মুখে মেয়েটা বলে, আদমি।

মেয়েটার মনে যেন সুখ নেই। গায়ে হলুদ শাড়ি, চোখে কাজল, হাতে মেহেদির রং, তবু তার কোথায় যেন রংহীনতা ফুটে আছে। তার সুডৌল হাতে উল্কির ছাপ, কাচের চুড়ি, রুপপার গয়না, তবু হাত দুখানা বড় উদ্দেশ্যহীন। কপালে টিকলি পরেছে সে, লম্বা চুল বেণীতে বাঁধা, তবু সব সাজের ভিতর থেকে দেহাতের গমের খেতে গোধূলির নির্জন উদাসীন বৈরাগ্য ফুটে আছে।

গৌর জিজ্ঞেস করে, এখানে মরতে কী করছিলে?

মেয়েলি হিন্দিতে মেয়েটি বলে, খেতে ফসল হয় না। মাটি মরে গেছে। আমাদের খেতিও ছিল ছোট। আদমিটা বাজি দেখাতে জানত। আমি নাচতাম। দেহাতে ওসবের পয়সা কেউ দেয় না। তাই আমরা শহরে চলে আসি। বাজি দেখাই। আমার আদমি লাঠি ঘোরায়,

চারটে ছোরা শুন্যে ছুঁড়ে লুফে নেয়, লোহার গোলার খেলা দেখায়, কাঠির ওপর পিরিচ ঘোরায়, হেঁটমাথা হয়ে পায়ের ওপর ঢোল নাচায়, কত কী করে!

আর তুমি?

মেয়েটি একটু হাসে, আমি নাচি। ঘাগরা দুলিয়ে, বেণী দুলিয়ে, ঝমঝম করে। লোকে পয়সা দেয়।

এই বলে মেয়েটা কৌতূহলে গৌরকে দেখে। কী দেখে তা গৌর, অর্থাৎ বগলুর তিন নম্বর, জানে। টাইফয়েডের খাজনা দিতে শুকিয়ে যাওয়া হাতখানা, আর পা, আর চোয়াড়ে মুখ।

ভারী বিরক্ত হয় গৌর। মার শালা গৌরার কপালখানায় তিন লাথি। গৌরার যে আর দেখাবার কিছু নেই মাইরি!

পাখির স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, আমাদের নেবে না?

গাড্ডা। গৌরের ল্যান্ডমাস্টারে এখন এক দাতি-লাগা বুড়ি উঠবে। গৌরের সুখ নেই, তবু সে মাথা নেড়ে বলে, নেব, নিয়ে এসো।

কত নেবে?

মিটারে যা ওঠে। বলে গৌর হাসে, তারপর চোখ ছোট করে বলে, আর একদিন তোমার নাচ দেখিয়ে দিয়ে।

মেয়েটা একপলক গৌরকে দেখে, তারপরই আবার দেহাতি উদাসীনতা মেখে নেয় মুখে। বলে, কত লোক তো দেখে! তুমিও কোথাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখে নিয়ো।

বালা-পরা সুন্দর পুরুষটা মুখ ফিরিয়ে রাগের গলায় কী একটা নাম ধরে মেয়েটাকে ডাকে। গৌর নামটা ঠিক বুঝতে পারে না। মেয়েটা ঝুঁকে বলে, একটু দাঁড়াও, আমাদের পোঁটলা-পুঁটলি তুলতে হবে কিন্তু।

গৌর মাথা নেড়ে সিগারেট ধরায়।

বিস্তর পোঁটলা-পুঁটলি, লাঠি, কাটারি ওঠে ল্যান্ডমাস্টারের লাগেজ বুটে। ততক্ষণে মেয়োর নাকের নীচে নিটোল ঘামের ফোটা জমে ওঠে। পুরু পুরু দুটি ঠোঁট ভিজে যায় জিভের লালায়। সুন্দর পুরুষটির মুখে জবজবে ঘাম, পাগড়ি শিথিল। তারা খুব অস্বস্তির সঙ্গে পিছনের সিটে বসে থাকে কাঠ হয়ে। মাঝখানে এলিয়ে আছে বুড়ি। তার চোখ বোজা।

দৃশ্যটা দেখে আয়না একটু ঘুরিয়ে দেয় গৌর। মেয়েটার মুখ ভেসে ওঠে। গভীর কাজলের ভিতর থেকে দু' খানা চোখের উদাসীনতা দেখা যায়। আর ভয়। ক্ষুধা। ফিফটি পারসেন্ট গৌরা মেয়েটার মুখে চোখ রেখে ল্যান্ডমাস্টার চালু করে।

খুব শিগগির পৌঁছে যাওয়ার কথা। গৌর গাড়িও ছাড়ে জোরে। কিন্তু পৌছোয় না। ময়দানের ফাকা রাস্তা দিয়ে অকারণ চক্কর দিতে থাকে। এ রাস্তা ও রাস্তা করে ভবানীপুরের দিকে চলে আসে। অলিগলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে দেয়।

লোকটা নড়েচড়ে বসে। মেয়েটা হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে, কোথায় যাচ্ছ? এ তো অন্য রাস্তা।

গৌর গম্ভীর গলায় বলে, সব রাস্তায় গাড়ি যায় না। ঘুরে যেতে হবে।

তুমি ভুল রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছ আমাদের।

গৌর উদাস গলায় বলে, সন্দেহ হলে নেবে যাও।

পুরুষটা মেয়েটাকে ধমক দিয়ে বলে, চোপ। কলকাতার তুই কী জানিস?

মেয়েটা চোখের বিদ্যুৎ পলকে তার পুরুষকে স্পর্শ করে বলে, আমি জানি, ও ভুল রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে।

নিক। কত নেবে? রাস্তা ঠিক পেয়ে যাব।

মেয়েটা দমে না। হাত বাড়িয়ে গৌরের শার্ট খামচে ধরে বলে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

গৌর বিনীত স্বরে বলে, পেছন থেকে ছোরা বসিয়ে দাও না। কিংবা মারো লাঠি। পুলিশও ডাকতে পারো।

মেয়েটা জামা ছেড়ে দিয়ে হাসতে থাকে। আয়নায় গৌর দেখে, কী সুন্দর সাদা দাঁত! এমন ঝকঝকে সরল পঁাত সে কারও দেখেনি।

দেহাতি লোকটা দার্শনিক। ঠিক জানে তাদের বেশিদূরে নিয়ে যেতে পারবে না। কলকাতার ঘুণচরে ঘুরে খানিক মিটার ওঠাবে মাত্র। দেহাতি বোকাসোকা লোক, ঝগড়া করে পারবে না। মিটার যা ওঠে তা দিয়ে দেবে। রুখখা-শুখো হাত-পা-ওলা আর মাথায় এক বেহদ্দ মাগির পাগলা নাচ নিয়ে গৌর কোনও শালার কিছুই আর কেড়ে নিতে পারে না। এইসব ভাবে গৌর আর গাড়িটাকে বেমক্কা ঘোরায়। যে রাস্তায় যায়, ঘুরেফিরে আবার সেই রাস্তায় আসে। কী যে সঠিক সে চায় তা বুঝতে পারে না।

আরে বাঃ! এতক্ষণ মেয়েটা আয়নাটা লক্ষ করেনি। এখন করেছে। গৌর চোখ তুলেই মেয়েটার চোখ দেখতে পায় একপলক। মেয়েটা স্থিরদৃষ্টিতে আয়নার দিকে চেয়ে আছে। চোখে প্রথমে ভয়, তারপর কৌতূহল দেখা দেয়। গৌর চেয়ে থাকে। ল্যান্ডমাস্টার টাল খায়। কিন্তু বহুকালের পোষা গাড়ি বলে বে-জায়গায় টক্কর খায় না। গৌর সামলে নেয়। আবার আয়নায় চোখ চলে যায়। মেয়েটা চেয়ে আছে। চোখ পড়তেই রহস্যময় হাসে। ঘোমটা তুলে আধখানা মুখ ঢাকে মেয়েটা, ঢাকে সেই দিকটা যে দিকে তার শাশুড়ি আর স্বামী রয়েছে। তারপর হঠাৎ চোখ ছোট করে জিব বের করে গৌরকে ভেঙিয়ে দেয়। আরে বাঃ! খুব শিখেছে তো!

লোকটা গৌরের যথেচ্ছাচারে বাধা দেয় না। কেবল একবার বিরক্ত হয়ে ভিতু গলায় বলে, একটু আস্তে চলো না ভাই। আমার বুড়ি মার শরীর ভাল না, জোরে চললে বুড়িমার কষ্ট হবে।

গৌর একটু স্পিড কমায়, আবার বাড়ায়। ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে। ঘাড়ের যে জায়গাটায় মেয়েটা শার্টের কলার চেপে ধরেছিল সে জায়গাটা একটু শিরশির করে। ল্যান্ডমাস্টারটা জলের মতো বয়ে যায়। তাতে অনেক মুখের ছায়া পড়ে, আঙুলে কেউ বা জলে ছবি এঁকে যায়। কিছুই থাকে না। ক্ষণস্থায়ি একটি দেহাতি মেয়ের মুখ গৌর তার আয়নায় কতক্ষণ বা ধরে রাখতে পারে!

ল্যান্ডমাস্টার গাঁই গাঁই করে ঘোরে। জলের মতো বয়ে যায়। মেয়েটা যে কোণে বসে আছে, সেই কোণে একটু হেলে আধবোজা চোখে বসে ছিল মতিয়া। বহুদিন হয়ে গেল, তবু গৌরের হুবহু মনে আছে, দুর্লভ আতরের গন্ধে ভরে গিয়েছিল ল্যান্ডমাস্টার, সবুজ কাচের মতো স্বচ্ছ ওড়নার সোনালি চুমকির পিছনে তার মুখ। চমকে চুমকি জ্বলে জ্বলে উঠেছিল বার বার। ওড়না উড়ছিল হাওয়ায়। সিল্কের লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ পরে লাল রঙের সুন্দর মতিয়া আধশোয়া হয়ে পড়েছিল। সেইদিনই ল্যান্ডমাস্টারের দশ পারসেন্ট আয়ু বেড়ে যায়।

কিন্তু কিছুই থাকে না। সেই আতরের সুগন্ধ লোকের গায়ে লেগে লেগে মুছে গেছে। ঘাসপাতার সুবাস-ওলা এই মেয়েটির সতেজ শরীর, একটু ঘামে-ভেজা গায়ের বোঁটকা গন্ধ ল্যান্ডমাস্টারের গদির গায়ে কতক্ষণ লেগে থাকবে! ট্যাক্সি আসলে এক বহমান নদী। স্রোতে ছায়া পড়ে, ভেঙে যায়।

গৌর শ্বাস ফেলে গাড়ি আনে সহজ রাস্তায়। পার্ক সার্কাসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, মিটারে দেড় টাকার মতো বেশি উঠে গেছে, মৌতাতের সময়টা এগিয়ে আসছে ক্রমে।

চোখে ঘুমের আঁষ জড়িয়ে আসে। কোন শূন্য থেকে লাল নীল হলুদ বল নেমে আসে পৃথিবীতে। চরাচর জুড়ে রঙিন বলগুলো ওড়ে কেবল। ঢাকার কামান নিঃশব্দে গোলা ছেড়েন্যে। মুহুর্মুহু দাগতে থাকে গোলা। গৌরের আয়নায় মেয়েটা ঘোমটায় আধোঢ়কা মুখে আবার জিব ভেঙায়। তার খাঁদা নাকের নীচে ফোটা ফোটা ঘাম জমছে। দেহাতি শরীরের কাচা গন্ধ, তার সঙ্গে রোদ-মাটির সুবাস, গাছপালার ক্লোরোফিল সব

ল্যান্ডমাস্টারের ভিতরকার চৌকানা বাতাসকে টইটম্বুর করে দেয়। গৌর খাস টানে। তবু সোয়ারি খালাস দিতে হবে বগলুর তিন নম্বরকে। তারপর দাশ কেবিন। গৌরের সঙ্গে দু'খানা রুখে-শুখো হাত পায়ের মতোই সেঁটে গেছে ল্যান্ডমাস্টার। সেঁটে গেছে দাশ কেবিন। সেঁটে গেছে কলকাতার রাস্তাঘাট। মিউনিসিপ্যালিটির ম্যাপ। মিটারের পরিবর্তনশীল সংখ্যা আর মিটার ঘোরানোর টুংটাং। মৌতাতের সময়ে ঢাকার কামান কোন দূর থেকে ঠিক রঙিন বল ছুঁড়ে মারে আকাশে। রাস্তার ওপর দিকে উঠে যায়। কলকাতার মাঝখানে কারা যেন জলময় শহর বানিয়ে রেখে যায়। গাভীর ডাক শোনে গৌর। মোড়ের ট্রাফিক পুলিশ হঠাৎ ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলে কদমতলার বাঁশের বাঁশিটি আড় করে ধরে পা দুটো ক্রশ করে কৃষ্ণের কায়দায় দাঁড়ায়। এ সব জিনিসই সেঁটে গেছে গৌরের সঙ্গে। এর কোনও পরিবর্তন নেই।

গৌর শেকসপিয়ার সরণি পেয়ে যায়। লোকজন ভুসভাস উড়ে যাচ্ছে। ফঁকা রাস্তায় গাড়ি জোরে ছাড়ে গৌর। পিছনে বুড়িটা ককিয়ে ওঠে। অস্ফুট ভয়ের শব্দ করে পুরুষটা। মেয়েটা মুখ ভেঙাতে গিয়ে হঠাৎ টের পায় বাতাসে ঘোমটা উড়ে গেছে, স্বামী চেয়ে আছে তার দিকে। লজ্জায় জিব কাটে সে। বাতাস তার বেণীতে বাঁধা চুল লুট করে এনে কপালে ঝাপটা মারে। গৌরের গাড়ি গতির যন্ত্রণায় গোঙায়। টায়ার রাস্তায় গভীর বসে যায় লাঙলের মতো। গাড়ির জোর টানে ল্যান্ডমাস্টারের গভীর গদির মধ্যে দেহাতিরা সেঁধিয়ে যেতে থাকে, ডুবে যেতে থাকে।

কোথায় যেন! আঃ, পার্ক সার্কাস। গৌরের মনে পড়ে। আবার ভুলে যায় গৌর। আবার মনে পড়ে। রাস্তাগুলো ঠিকঠাক চেনা লাগে না। আয়নায় দেহাতি মেয়েটার সুন্দর সরল মুখখানা ঝাপসা হয়ে যায়। একটা সবুজ নিয়োন সাইন দপদপিয়ে ওঠে। প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারে না গৌর। তারপর দেখে, সবুজ মিয়োন সাইন দপ করে জ্বলে উঠে বলে, তুমি... তুমি... চাও... চাও... লায়লার... লায়লার... রুটি... রুটি...। আবার সব মুছে যায়। মেয়েটির মুখ দেখতে পায় গৌর। চোখে গমখেতের ধূসর বৈরাগ্য, অবহেলা, আবার কৌতুকও। আবার মুখ মুছে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পায় গৌর, ল্যান্ডমাস্টারের সামনে পার্ক

স্ট্রিট, পিছনে এক দূর সমুদ্রের ছবি আয়নায় ফুটে উঠেছে। গভীর বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে একটা হলদে জাহাজের মাস্তুল দেখা যায়। জল দোলে, মাস্তুল দোলে, মানুষের বুক দুলে দুলে ওঠে। গৌর আর গৌর থাকে না। তার ল্যান্ডমাস্টারও নিজেকে ভুলে যায়। গাড়ি জমি ছেড়ে হঠাৎ সমুদ্রে লাফ দেয়। তুলে দেয় মাস্তুল। গৌর হর্ন টেপে। অবিকল জাহাজের ভো-ও-ও-ও শব্দ বেজে ওঠে। ল্যান্ডমাস্টার জাহাজ হয়ে চলতে থাকে। সমুদ্র পাড়ি দেয়। দূরে এবং বিদেশি বন্দরে আঙুরের লতায় ছায়ায় থাপা থাপা সবুজ ফল ঝুলে আছে। ঝিরঝিরে নদী বয়ে যাচ্ছে। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজঘাটায়। উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়েছে বলে সমুদ্রের প্রবল বাতাসে চুল উড়ছে তার, উড়ছে ঘাগরা। পিছনে টিলার উপরে ছোট্ট বাসা। বাসা ঘিরে বাগান। কত ফুল ফুটে আছে। জাহাজ হওয়া ল্যান্ডমাস্টার থেকে সব দেখা যায়। জাহাজ মেয়েটির দিকে, বন্দরের দিকে এগোয় ধীরে ধীরে। ভো দেয়। মেয়েটা একখানা হাত তোলে। কী আনন্দিত হাতখানা, সেই হাতে কী নিয়ন্ত্রণ! গৌর স্পষ্ট বুঝতে পারে, এই হচ্ছে তার মেয়েমানুষ। ওই টিলার ওপরকার রঙিন সুন্দর বাগান-ঘেরা বাড়িটা তার ডেরা। বহুকাল সমুদ্রযাত্রার শেষে সে ফিরে আসছে।

গৌরের মাথার ভিতরে কোথায় সবুজ আলোটা জ্বলে জ্বলে ওঠে, তুমি চাও...তুমি চাও...তুমি চাও। কী যে চায় গৌর তা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না। আয়নায় একখানা উল্কিপরা হাত ঝলক দিয়ে কুয়াশায় মিলিয়ে যায়। ল্যান্ডমাস্টার, জাহাজ বিপুল জলরাশি ভেদ করে চলতে থাকে, দুলতে থাকে। আয়নায় বিচিত্র বিচিত্র সব ছায়া পড়ে। নিসর্গ ভেসে ওঠে! আঙুরফলের গা বেয়ে টসটসে রস ঝরে পড়ে। মাতাল মৌমাছিদের অনন্ত পিপাসার শব্দ হয়। টিলার ওপর ছোট্ট বাড়ি, রঙিন ফুল, জাহাজঘাটায় একা একটি বাতিঘরের মতো মেয়ে, এই সবই কি গৌর চায়? লায়লার রুটির বিজ্ঞাপন তেমন স্পষ্ট করে কিছুই বলে না। শুধু বলে, তুমি চাও...তুমি চাও...তুমি চাও...

আই! আলবত গৌর চায়। গৌর চায় মেলা কিছু। কত কী যে চায় গৌর তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এক-একদিন তার মৌতাত জমে উঠলে ল্যান্ডমাস্টারের মুখ ঘুরিয়ে কলকাতার জাঙ্গাল ভেঙে চলে যেতে ইচ্ছে করে। কোথায় যাবে ঠিক জানে না গৌর। তবে হয়তো

যাবে, কোনও ডুবজল নদীর ধারে, গাছের ছায়ায় বসে স্বচ্ছ জলের নীচে মাছেদের খেলা দেখবে। দেখবে গমের খেতের পাড়ে সূর্যাস্ত। সমুদ্রের ভিতর থেকে দেখবে দূর বিদেশি বন্দরে দাঁড়িয়ে তার মেয়েমানুষের হাতছানি। টিলার ওপর রঙিন ফুলে-ঘেরা বাড়ি।

কিন্তু না। মাথা নাড়ে গৌর। যাওয়া যাবে না কখনও। তার সঙ্গে সেঁটে গেছে ল্যান্ডমাস্টার, ল্যান্ডমাস্টারের সঙ্গে সেঁটে গেছে কলকাতা, কলকাতার সঙ্গে সেঁটে গেছে বগলুর তিন নম্বরের কপাল।

আই বাপ। আর একটু হলে ট্রামের পিছনে ল্যান্ডমাস্টারটাকে ভিড়িয়ে দিচ্ছিলে বাবা! গৌর বিড়বিড় করে। একঝটকায় ট্রামটাকে পার হয়ে যায়। পিছন থেকে দেহাতি লোকটা চেঁচায়, বোখকে রোখকে, বাঁয়া তরফ।

গৌর থামে।

দেহাতিরা একে একে নেমে রাস্তায় দাঁড়ায়। লোকটা এগিয়ে এসে বলে, কিতনা?

গৌর কষ্টে মিটারটা দেখার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণের চেষ্টায় দেখতে পায় মিটারে পঞ্চাশ টাকা উঠছে। যখনই মৌতাতের সময়ে এরকম অদ্ভুত সব সংখ্যা দেখে গৌর তখনই মনে মনে সংখ্যাটাকে দশ দিয়ে ভাগ করে নেয়। হিসেব ঠিকঠাক মিলে যায়।

পাঁচ টাকা।

লোকটা টাকা দেয়। সভয়ে একটুক্ষণ গৌরকে দেখে। দেখে, এই রুখখা-শুখো হাত-পায়ের লোকটা কেমন স্থলের গাড়ি জলে ভাসায়। আবার জলের জাহাজ আকাশে ওড়ায়। লোকটাকে দেখে রাখে দেহাতি। দেশে ফিরে গল্প করবে।

দেহাতির কাঁধে একটা ভাগলপুরি চাদর। সেই চাদরের ওপর দিয়ে গৌর এক ঝলক মেয়েটাকে দেখে নেয়। গৌরের গাড়িতে চড়ার ক্ষণকালের উত্তেজনার শেষে মেয়েটি আবার উদাস হয়ে গেছে। কলকাতার কঠিন রাস্তায় এই দারুণ রোদে নাচতে নাচতে তার

পায়ে ফোস্কা পড়েছে হয়তো, কত কাল সে গেহঁর খেতি দেখে না, পোড়া পাতার সুঘ্রাণ নেয় না বুকের বাতাস ভরে। কত কাল নিজের আনন্দে নাচেনি সে। গৌর চোখ ফিরিয়ে নেয়। গাড়ি ছাড়ে। দাশ কেবিন।

গৌরের পিছনের সিটে একটা রঙিন টিপ পড়ে থাকে। বাতাসে মেয়েটার কপাল থেকে খসে পড়েছিল। আবার কোনও সোয়ারির গায়ে সেঁটে একদিন উঠে যাবে টিপটা। গৌর টেরও পাবে না।

৩. দালানকোঠা

দালানকোঠাই করতে চেয়েছিলেন বগলাপতি। কিন্তু জবরদখল জমিতে ছাদ দেওয়া বারণ। তাই ছাদটা হয়নি। পাকা ভিতের ওপর দেয়াল উঠেছে। ওপরে টিন। ঘর দু'খানা। রাখোহরির পরিবারের সঙ্গে যখন এখানে প্রথম এসেছিল গৌর তখন বাড়িটা জমজম করত। ওরা চলে যেতে আবার সব নেতিয়ে পড়েছে। যাওয়ার সময় আলমারি, বাক্স, চেয়ার, টেবিল সবই নিয়ে গেল রাখোহরি, ভাঙাচোরা দু'-একটা আসবাব, কম দামের তক্তপোশ, হেঁড়া বই-কাগজ, সংসারে জমে ওঠা আবর্জনা আর গৌরহরিকে ফেলে রেখে গেল। সেই থেকে গৌর ভাবে, বাড়িটা তার নিজের হয়ে গেছে বুঝি। বগলাপতির সবই দখল করে নিয়েছে রাখোহবি। এই হাফ-ফিনিশ বাড়িটার ওপর দাবি-দাওয়া বোধহয় ছেড়েই দেবে। দলিল-দস্তাবেজ নেড়েচেড়ে দেখেছে গৌর, একে ওকে তাকে দেখিয়েছে। না, বাড়িটা পেলে পাবে তাদের তিন ভাই। কিন্তু গৌরের আশা, অত পেয়ে রাখোহরি বোধহয় আর এটা চাইবেনা। কিন্তু কেবলই একটা আশা-নিরাশার ভিতরে থাকে গৌর। ঠিক বুঝতে পারে না। রাখোহরি কী চাইবে আর চাইবে না। যদি চায় তো কী করবে গৌর? যদি সামনে এসে দাঁড়ায় সুন্দর রাখোহরি, যদি লড়ে, যদি চায় তো দিয়েই দিতে হবে।

একটা ঘর ফাঁকা পড়ে থাকে। সেখানে পুরনো ব্যাটারি, পুরনো টায়ার, গাড়ি সারানোর কিছু যন্ত্রপাতি পড়ে থাকে। অন্য ঘরটায় একখানা তক্তপোশ, দুখানা সস্তা বেতের চেয়ার, দু'একটা ট্রাঙ্ক, বাক্স, একটা ফ্যান, দু-একটা থালাবাসন। ব্যস, আর কিছু নেই। ঘর দু'খানা ঘিরে কাঠা চারেক জমি। উত্তরদিকে খানিকটা নন্দীরা সীমানা-দেয়াল দেওয়ার সময়ে দখল করে নিয়েছে। রাখোহরি থাকলে পারত না। নন্দীবাড়ির মেয়েটা সকালে বা বিকেলের দিকে গৌর বাড়ি থাকলে এক-একদিন কুঁচো নিমকি দিয়ে চা দিয়ে গেছে। সঁটো শরীরের মেয়ে, দু'বার তাকাতে ইচ্ছে হয়। তার ওপর চা নিমকি! এসব গৌরের

সামনে রেখে নন্দীরা তার নাকের ডগাতেই হাতখানেক ভিতরে দেয়ালের জন্য ধরল, গৌরকে ডেকে দেখাল, দেখ তো, ঠিক আছে? গৌর নিঃশব্দে মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে। দেয়াল উঠে গেল। গৌরের লজ্জায় কিছু বলা হল না। তা যাক গে এক হাত জমি। গিয়েও যা আছে তা গৌরের পক্ষে অনেক। সামনের দিকে শখ করে বাগান করেছিলেন বগলাপতি। এখন বাগান হেজে-মজে আগাছার জঙ্গল। একটু উঠোন মতো জায়গায় প্রকাণ্ড জামরুল গাছ ছায়া দেয়। মাঝে মাঝে গাছটা জামরুলে ছেয়ে যায়। গাছের গায়ে কাঠপিপড়ের বাসা। সেইসব পিঁপড়েদের তুচ্ছ করে কচিকটি জামরুল পাড়ে বাচ্চা ছেলেরা। ডাল ভাঙে, পাতা ছড়ায়। গৌর কিছু বলে না। বাগানের বেড়াটা ভেঙে গেছে কবে। গৌর সারায়নি। গোরু ঢুকে আগাছা খায় মটমট করে। পিছনের দিকে ঘর থেকে দুরে সেপটিক ট্যাঙ্কওলা পায়খানা আর বাথরুম, টিউবওয়েল ফিট করেছিলেন বগলাপতি। সে সবই রংচটা, পিছল, ভাঙা হয়ে পড়ে আছে। বাথরুমে যেতে বুক-সমান জঙ্গল। কচুপাতা, বিছুটি বন, ভাট আর ভাং গাছে ছেয়ে আছে। তার পিছনে বারোয়ারি পুকুর। অনেক রাতে পুকুরের জলে মাছ ঘাই দেয়, ব্যাং লাফিয়ে পড়ে। দেশ-গাঁয়ের শব্দের মতো সব শব্দ ওঠে। পুকুরের আঁশটে গন্ধ ভেসে আসে। মশার ঝক পিন পিন করে। বাগানের একধারে গৌরের গ্যারেজ। সেখানে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় ল্যান্ডমাস্টার। গৃহস্থ যেমন মাঝরাতে গোয়ালঘরে শব্দ পেলে কুপি জ্বালিয়ে দেখে আসে, ঠিক সেই রকম গ্যারেজে খুটখুট শব্দ পেলে গৌর টর্চ জ্বালিয়ে বেরোয়। ল্যান্ডমাস্টারখানা দেখে আসে। বগলাপতির দেওয়া সেকেন্ডহ্যান্ড ল্যাভুটা ছাড়া তার আর আছেটা কী?

ক'দিন পর পর বৃষ্টি গেছে খুব। কলকাতার রাস্তা-ঘাটে এখনও হাটুভর জল জমে আছে। গৌর তাই আজ সকালে গাড়ি বের করেনি। মেঘ কাটছে, রোদ উঠছে একটুখানি। উঠোনের মাঝখানে মাটি শুকিয়ে সাদা হচ্ছে ক্রমে। জামরুল গাছে এবার ফুল আসেনি। খুব পিপড়ে বাইছে। নন্দীদের পাঁচটা হাস পুকুর থেকে উঠে এসে গৌরের উঠোনে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়ায়। এ ওর ঝুটি ধরে পিঠে চাপে। একটা মাদি হাঁস খেলতে খেলতে সামলাতে না পেরে তলতলে একটা ডিম পেড়ে ফেলে মাটিতে, একটা হাঁস সেটা কপকপ করে খেয়ে নেয়। জামরুল গাছের ছায়ায় একটা বেতের চেয়ার টেনে এনে বসেছে গৌর।

কলকাতার একখানা স্ট্রিট ডাইরেক্টরিই গৌরের প্রিয় বই। অবসর পেলেই সেটা নিয়ে বসে। আজও বসেছে। কলকাতার সঙ্গে জানপয়ছান এখনও তার শেষ হয়নি। কবে হবে তা বলাও যায় না।

কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারে না সে। রাস্তার নাম মুখস্থ করতে করতে অন্য মনে চেয়ে থাকে। হাই তুলে বইখানা কোলে ফেলে রেখে তার বাড়িখানা দেখতে থাকে।

কতটুকুই বা জমি! কীই বা ভাল ঘরখানা। তবু বগলাপতির বড় সাধের বাড়িখানা। দেশের লোকদের সঙ্গে মিলেজুলে একদিন এইখানে থাকবেন, এরকম ইচ্ছে ছিল তার। ওদিকে বড়লোকদের পাড়ায় তিনতলাখানা ছাড়তেও কষ্ট হত তার। তাই এই বাড়িটা করে এক গরিব জ্ঞাতিকে বসিয়েছিলেন। কড়ার ছিল, যতদিন না বগলাপতির দরকার হয় ততদিন বিনা ভাড়ায় থাকবে। জ্ঞাতি কাকা হরিরাম সেই থেকে বসলেন বাড়িটায়। পুরুত মানুষ, খুব নিরীহ। তার পাঁচ ছেলেমেয়ে, বউ, বিধবা বোন নিয়ে বিরাট সংসার। কষ্টে চলত। বড় ছেলে নিতাই ছিল ব্যাঙ্কের পিয়োন। কী ভাগ্যে তার বউটা হল সুন্দরী। সেই বউই অবশেষে ভাগ্য ফিরিয়ে দিল তার। বিকেলের দিকে সাজগোজ করে বেরোত, একটু বেশি রাতে ফিরে আসত আবার। ঘরের বউয়ের মতোই চলাফেরা, শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে ঘোমটা, সব বজায় রেখে চলত সে। বিয়ের আগেকার এক হোকরা প্রেমিক ছিল তার। সে এখনও মুখের বড়শি ছাড়াতে পারেনি। চলে আসত রবিবারে রবিবারে। হাতে মাছ, মিষ্টি দইয়ের হাঁড়ি, বউটি তাকেও খুশি রাখত। চা খাওয়াত, ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন করত মাঝে মাঝে। সব বজায় রেখে বউটি নিতাইয়ের অবস্থা ফেরাতে লাগল আস্তে আস্তে। টেরিলিন-টেরিকটন পরতে লাগল নিতাই, সিগারেটের ব্র্যান্ড পালটে ফেলল। কিন্তু পাড়ায়। তখন তার বউয়ের নামে টিক্কির। কত লোক যে তাকে দামি গাড়িতে চড়ে অচেনা পুরুষদের সঙ্গে যেতে দেখেছে, কত লোক লক্ষ করেছে রাতে ফেরার সময়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত তাকে গাড়ি এসে পৌঁছে দেয়। তখন নিতাইয়ের বউয়ের পা টলমল করে, খোঁপায় ফুল গোঁজা থাকে। নিতাই সেসব শুনে ভারী বিরক্ত হয়ে বলত, রিফিউজিদের সঙ্গে থাকা যায় না। পাড়ার উঠতি মেয়েরা পাছে ওই বউয়ের খপ্পরে পরে যায় সেই ভয়ে প্রতিবেশীরা

মাঝে-মধ্যে চড়াও হলে নিতাই ঘর থেকে হেঁকে বলত, কেন তোমাকে সন্দেহ করে বলল তো! তুমি সত্যিই কিছু করো-টরো না তো? বউ কেঁদে বলত, ওমা! তাই কি পারিনিতাই বলত, আমার গা ছুঁয়ে বলল যে তুমি ওসব করো না! বউ তখন নিতাইয়ের গা ছুঁয়ে বলত যে সে ওসব করে না। তখন নিতাই বলত, তাহলে তোমার ভয় কী? সকলের মুখের ওপর বলে দাও সেই কথা। এ সব ঘটলে ক'দিন নিতাইয়ের বউ বেরোত না। তারপর আবার একদিন সাজগোজ করত, বেরোত, ফিরত রাত নিশুতির সময়ে। আবার তার বিয়ের আগের ছছাকরা প্রেমিক রোববার দই, মিষ্টি নিয়ে আসত। বগলাপতি কানাঘুষাে শুনে ডেকে পাঠালেন, এ সব কী শুনছি হরিরাম? হরিরাম ভারী তৃপ্তির হাসি হেসে বলতেন, ওরকম বউ হয় না। লক্ষ্মীমন্ত যাকে বলে। অবস্থার উন্নতি দেখলে কবে না পাঁচজন পাঁচ কথা বলেছে। ওই বউ আসার পর থেকেই আমাদের উন্নতি। বিষয়ি লোক বগলাপতি উন্নতির কথা শুনে খেকিয়ে উঠতেন, তোমার ছেলেরা কোন লাটসাহেবি পেয়েছে যে রাতারাতি উন্নতি হয়ে গেল? ওসব বোলো না। টাকাপয়সা কোন গলিখুঁজিতে ঘুরে বেড়ায় তা আমি জানি। আমার বাড়িতে থেকে ওসব চলবে না। হরিরাম ম্লান মুখে চলে গেলেন বটে কিন্তু তারপরই গোলমাল শুরু করে নিতাই আর হরিরামের আরও দুই ছেলে মাধু আর সতু। মাধু সতুর চেহারা বিশাল, স্কুলের এইট ক্লাসে আটকে পড়েছে, চুরি-চামারি দিয়ে বাল্যজীবন শুরু করে জোয়ান বয়সে বেশ ডাকাবুকো হয়ে উঠেছে। বাড়ির বউয়ের মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য তারাও দাঁড়িয়ে গেল। তাদের সবচেয়ে বড় স্বার্থ ছিল অবশ্য এই সাড়ে কাঠা জমিওলা বাড়িটা। জমি বগলাপতির বাপের নয়, জবরদখল। যে দখল করে তার। দখলের অনেক পরে সরকার নামে নামে মঞ্জুর করেছে জমি। হরিরামের ছেলেরা বলে বেড়াতে লাগল, এই জমি বাড়িতে বগলাপতি কখনও থাকেননি, সুতরাং জমি তার নয়। জবরদখল জমিতে বসবাস না করলে স্বত্ব জন্মায় না। তারাই এতকাল যখন বসবাস করেছে তখন জমি তাদেরই। এইসব বলে তারা পাড়ার লোককেও ভজাতে লাগল। বগলাপতি জ্ঞাতিভাই হরিরামকে ঠিক তুলে দিতে চাননি। চাইলে তুলতে পারতেন। তার বদলে তিনি হরিরামকে অন্য জায়গায় জমি দেখে দিয়ে বললেন, বাড়িটা ছেড়ে দাও। হরিরাম ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন, ছেলেরা ছাড়ল না। মাধু আর সতু তখন পাড়ার মস্তান।

নিতাইয়ের পকেটে বিস্তর নম্বরি নোট। তার আদুরি বউ বাড়িতে পাকা বাথরুম তুলে ট্যাপের জলে অনেকক্ষণ গন্ধ সাবান দিয়ে স্নান করে। কাউকে গ্রাহ্য করার নেই। পাড়ার ক্লাবে মোটা চাদা দেওয়া আছে। রাতে না ফিরলেও কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলে না। কয়েকটা নারকোল গাছ ছিল বাড়িতে, ফি বছর শ'খানেক নারকোল বগলাপতির বাড়িতে পৌঁছে দিত হরিরাম। গোটা কুড়ি সুপুরি গাছ থেকে প্রায় পনেরো বিশ সের সুপুরি আসত। হঠাৎ সেসব দেওয়া তারা বন্ধ করে দিল। বগলাপতির চাকর পৌষপার্বণের আগে নারকোল আনতে গিয়ে গলাধাকা খেয়ে ফিরে এল। হরিরাম এসে একদিন হাতে পৈতে জড়িয়ে কেঁদে পড়লেন, দাদা, আপনার জমিতে আমি পরগাছা। উঠতে চাই, কিন্তু ছেলেরা দিচ্ছে না। আপনি আমার দোষ নেবেন না। বগলাপতি শাস ফেললেন। মানুষটা বিষয় বটে কিন্তু হৃদয়হীন ছিলেন না। ভেবেচিন্তে বললেন, আমি যদিও রিফিউজি, কিন্তু জবরদখলের জমি আমার দরকার নেই। তুমিও অভাবী লোক, সময়মতো জমি নাওনি, এখন আর যাবে কোথায়? ওখানেই থেকে যাও। কিন্তু একটা শর্ত। আমার একটা ন্যাংলা-নুলো ছেলে আছে, গৌরা। ওর যদি কোনও চুলোয় যাওয়ার না থাকে তো তোমরা ওকে একখানা ঘর ছেড়ে দিয়ো। হরিরাম উত্তর দিলেন না। জামার হাতায় চোখ মুছে বললেন, দাদা, আমরা মা বাপ হয়েও ওই বাড়ির কোন কোণে পড়ে আছি, তো তোমার গৌরা। আমাদের দেশের বাড়িতে এ কোণে ও কোণে বেড়ালের মতো পড়ে থেকে কত জ্ঞাতি মানুষ হয়ে গেল, কত কর্মনাশা বুড়ো হয়ে দাবা তাস পাশা খেলে খেলে জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে মরল, কেউ ফিরেও দেখেনি। কিন্তু আমার ছেলেরা তো একান্নবর্তী পরিবার দেখেনি। বড়বউমা যদি আজই বলে তার বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়িকে আলাদা করে দিতে তো নিতাই তাই দেবে। ওরা রক্তের সম্পর্ক চেনেই না। জ্ঞাতি তো দূরের কথা। কুকুর বেড়ালটা যে এঁটোকাটা খায় তাও ওদের গায়ে লাগে।

বাড়িটা ওইভাবে একরকম হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। বগলাপতি আর উকিল-মোক্তার করেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, না-হর-এর জমির জন্য লড়াই করে খামোকা রক্ত জল হবে। কোর্ট তাকে ডিক্রি দিলেও উচ্ছেদ করতে পারবেন না। রিফিউজিদের জমির মায়া বড় বেশি। কলোনি থেকে এতকাল বসবাসের পর কেউ উচ্ছেদ হচ্ছে জানলে সবাই

রুখে দাঁড়াবে, দাঙ্গা লেগে যাবে। তিনি তা করেননি। উপরন্তু তিনি পুরনো আমলের লোক বলে জ্ঞাতির সম্পর্ক মানতেন। হরিরাম উচ্ছেদ হবে, এটা ভাবতে তার ভাল লাগত না বোধহয়।

কিন্তু সেই সময় ডাকাতের মতো এসে পড়ল রাখোহরি। বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নেওয়ার সময়ে সে হিসেবে নানারকম ফঁক-ফোকর দেখতে পাচ্ছিল। তাই নিয়ে বাপ-ব্যাটায় বখেরা লেগে যায়। বগলাপতির পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। তিনি হাত কচলে টাকা করেছেন। কাউকে চটাতেন না। তিনি ক্ষয়ক্ষতি হাসিমুখে সামলাতেন।আবার ধৈর্য ধরে সেই ক্ষয়পুরণও করতেন। মানুষকে খাতির করা ছিল তার স্বভাব। যার কাছ থেকে কাজ আদায় হওয়ার সম্ভাবনাও নেই তাকেও তিনি হাতে রাখতেন। জীবন বড় অনিশ্চিত। কখন কী হয় বলা যায় না। তার সেই পদ্ধতি কার্যকরীও হত। ফুড করপোরেশনের নগণ্য একজন কেরানিকে তার বউয়ের টিবির সময়ে খুব সাহায্য করেছিলেন বগলাপতি। সাহায্য না করলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু দেখা গেল পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই কী সব পরীক্ষা দিয়ে সেই কেরানি ডেপুটি সেক্রেটারি হয়ে গেল। বগলাপতিকে সে মনে রেখেছিল। বগলাপতির এই সহজ দার্শনিকতা রাখোহরি কখনও বুঝত না। বগলাপতি যে সরকারি অফিসের পিয়োন বা আর্দালিরও বাড়ির কুশল নেন, দুটো মিষ্টি কথা বলেন, মাঝে-মধ্যে একটা দুটো টাকা হাতে ধরিয়ে দেন, এটা তার ব্যক্তিত্বের অভাব বলেই ভেবে নিল রাখোহরি। সে তাই বুড়ো বয়সের বগলাপতিকে আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগল। যাদবপুরের জমি, ওটা বিক্রিও করা যাবে না, আমরা থাকবও না। হরিরাম আছে, থাক। কিন্তু রাখোহরি ছাড়ল না। সে বলল, জমির জন্য বলছি না। সাড়ে চার কাঠা জমি দিয়ে আমাদের হবেটা কী? কিন্তু ওরা যে আপনাকে অপমান করে, জমির ফসল দেয় না, আমাদের জমিতে আছে বলে যে ওদের কৃতজ্ঞতা নেই, তার জন্য কিছু করা দরকার। বগলাপতি শঙ্কিত হয়ে বললেন, ওদের সঙ্গে লাগতে যাওয়া ঠিক হবে না রাখু। গুন্ডা বদমাইশদের সঙ্গে লেগে ইজ্জত যাবে। রাখোহরি ফুসে উঠে বলে, আপনার ওইরকম ছেড়ে-দাও ছেড়ে দাও ভাব আমার বরাবর খারাপ লাগে। হরিকাকা থাকুন ক্ষতি নেই, কিন্তু তার ছেলেরা মাথা নিচু করে থাকবে না কেন? আমি ওদের মাথাটা নুইয়ে ছেড়ে

দিতে চাই। বগলাপতি তখন জিজ্ঞেস করলেন, কী করবি তুই? কী করতে চাস? রাখোহরি বলল, মামলা করব। বগলাপতি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। জবরদখলের জমি, বিক্রিবাটার স্বত্ব নেই, বসতও করবে না কেউ, ওই নীরেস চার কাঠার মামলায় টাকা খাওয়ানোর মতো অপচয় হয় না। মামলা-মোকদ্দমা বগলাপতি বরাবর এড়িয়ে গেছেন। যেখানে কিছু ছেড়ে দিলে হয়, সেখানে বরাবর বগলাপতি কিছু ছেড়েছেন। মামলা করেননি।

কিন্তু রাখোহরি দাপের লোক। বগলাপতির সেকেলে পদ্ধতি সে মুহুর্মুহু বাতিল করে দিচ্ছিল। কিন্তু সে নির্বোধ ছিল না। সে বুঝতে পেরেছিল, মামলায় ডিক্রি পেলেও উদ্বাস্তু কললানি থেকে কাউকে বিধিমতো উচ্ছেদ করাও শক্ত ব্যাপার। কোর্টের পেয়াদা কিংবা পুলিশ গিয়েও সুবিধে করতে পারবে না। তাই সে অন্য কায়দা নিল।

সে সময়ে মাঝে মাঝেই ডজ গাড়িটায় রাখোহরিকে নিয়ে বেরোত গৌর। দু-চার জায়গায় কী সব খোঁজখবর নিয়ে রাখোহরি একদিন ডজ গাড়িটা যাদবপুরের সেন্ট্রাল রোডে বিকেলের দিকে দাড় করাল। সিগারেট ধরিয়ে গৌরকে বলল, তুই ঘুরে-টুরে আয়, আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করব। নেচে নেচে গৌর একটু দূরে গিয়ে পুকুরপাড়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। সে সময়ে দূর থেকে দেখতে পেল, ভারী সুন্দর একখানা মেয়ে এসে উঠল তাদের গাড়িতে। পুরনো আমলের গাড়ি, এখনকার মতো বড় বড় কাচ লাগানো নয়। ভিতরটা একটু অন্ধকার, জানালা দরজা ঘোট ছোট। সেই অন্ধকারে কী যে হচ্ছিল তা বুঝতে পারল না গৌর। একটু পরেই অবশ্য গৌরকে ডেকে গাড়ি ছাড়তে বলল রাখোহরি। মেয়েটা তখন নেমে গেছে। কিন্তু আবার কদিন পর সেন্ট্রাল রোডে ডজ গাড়ি দাড় করিয়ে অপেক্ষা করল রাখোহরি। মেয়েটা আবার এল। কাছ থেকে গৌর চিনতে পারল, নিতাইয়ের বউ। পালে-পার্বণে তাদের বাড়ি অনেকবার গেছে। সেদিন আর নিতাইয়ের বউ নেমে গেল না, ময়দানে ঘুরে ঘুরে অনেকক্ষণ হাওয়া খেল রাখোহরির সঙ্গে। কত হাসি গল্প, ঠাট্টা-ঠিসি, গায়ে গায়ে ঢলে ঢলে পড়া! বড় লজ্জা করছিল গৌরের। কথার মাঝখানে একবার রাখোহরি তার পাসপোর্ট বের করে নিতাইয়ের বউকে দেখিয়ে বলল, দেখো, এখনও তাজা পাসপোর্ট। ইচ্ছে করলে এক্ষুনি আবার বিলেতে

চলে যেতে পারি। যদি বিয়ে করি তো বউয়েরও ভিসা পেয়ে যাব। তখন গৌর অল্পবুদ্ধিতেও বুঝতে পারল, বিস্তর মেম-ঘাটা রাখোহরি নিতাইয়ের হাফ-গেরস্ত বউয়ের জন্য একটুও নয়, অন্য কারণে লেজে খেলাচ্ছে বউটাকে। রাখোহরিরও ফোর-সাইট ছিল। বুঝেছিল, এ মেয়েকে কেবল টাকা বা ভয় দেখালে কিছু হবে না। এমন কিছু দেখাতে হবে যা নতুন, যার মধ্যে চমক আছে। পাসপোর্ট ভিসা আর বিলেতের গল্পে সেই কাজটা হয়ে গেল। বিলেতের গল্প শুনতে শুনতে ভারী নেতিয়ে পড়ত নিতাইয়ের বউ, শ্বাস ফেলতে ভুলে যেত। রাখোহরি গল্প বলতেও জানত। গোল্ডার্স গ্রিনের শীতের রোদ, ট্রাফলগার স্কোয়ারের পায়রা, হাইড পার্কের সবুজ ঘাস, বিখ্যাত কান্ট্রিসাইডের টিলা, শৌখিন জঙ্গলে শিকার, গলফ লিঙ্কে ছুটির দুপুর, উইক এন্ডে সমুদ্রের ধারের একশো মজা, সব জীবন্ত হয়ে উঠত। ছুটিছাটায় প্যারিস, মোমবাতির আলোয় ডিনার আর নাচ। সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ি হ্রদের ধারে চেরি আর আপেলের খেত, ইটালির জলপাইরঙের মানুষ দেখে বেড়াননা। কলকাতার দ-য়ে পড়ে থাকা নিতাইয়ের বউয়ের বুকের ভিতরে ঝড় তুলে দিল রাখোহরি। আর সামনের সিটে বসে গাড়ি চালাতে চালাতে গৌর ওই সব গল্প শুনতে শুনতে কলকাতার কথা ভুলে গিয়ে উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে কেবল বিদেশি রাস্তার দৃশ্য দেখত।

রাখোহরির কয়েকটা পোষা ভূত আছে। সেই ভূতগুলোকে সে মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দিত। নিতাইয়ের বউটা কয়েকদিনের মধ্যেই ভূতে পাওয়া মানুষ হয়ে গেল। রাখোহরি গৌরকে কোনওদিন পুরো মানুষ বলে ভাবেনি। তাই তার সামনেই ভূত ঢোকানোর খেলা খেলত। একদিন ময়দানের ধার ঘেঁষে গাড়ি যাচ্ছে, বসন্তকাল, হাওয়া-টাওয়াও ভালই দিচ্ছিল, দু-চারবার কোকিলও ডাকল নিয়মমতো, সে সময়ে গৌরের গায়ে রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ, সে শুনতে পেল, রাখোহরি নিতাইয়ের বউকে বলছে, চলো বিয়েটা সেরে ফেলি।

সে কী? তা কী করে হবে? বউটা বলে অবাক হয়ে।

রাখোহরি হাসে, আইনে আটকায় জানি। কিন্তু এখন ডাইভোর্স করতে গেলে অনেক ঝামেলা। আর তার দরকারই বা কী? আমরা যদি বিলেতে পালিয়ে যাই নিতাইয়ের সাধ্য নেই অত দুরের পাল্লায় কিছু করে। কিন্তু পালিয়ে যেতে হলেও পাসপোর্ট ভিসা তো চাই। তাতে ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা দরকার। তাই বলছিলাম। একটা রেজিস্ট্রি করে আমি তোমাকে বউ বলে পরিচয় দিয়ে পাসপোর্ট ভিসার দরখাস্ত দাখিল করি। বউয়ের জন্য ভিসা পেতে বড়জোর দিন কুড়ি লাগে, তারপর-

বউটা শ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে তখন। ডজ গাড়ির আয়নায় গৌর দেখে, নিতাইয়ের বউয়ের ঠোঁট কাপছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, ফুলে ফুলে উঠছে নাকের পাটা। তারপর আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ল বউটা। মিনমিন করে জিজ্ঞেস করল, কবে?

সাড়ে চার কাঠা জমির জন্য বিস্তর ভূতের খেলা দেখাল রাখোহরি। সেই থেকেই গৌর জানে রাখোহরির মতো লড়াকু হয় না। ভাবলে আজও গৌরের গায়ে রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায়।

পাসপোর্ট ভিসা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর একদিন সকালে নিতাই এসে রাখোহরিকে ধরল, দাদা, এ কী শুনছি?

কী শুনছ?

সে বড় পাপকথা! এ সব করবেন না, ভাল হবে না। আমি পুলিশে খবর দেব।

দাও।-উদাসভাবে হাই তুলে রাখোহরি বলে।

এ সব করবেন না। আবার বলে নিতাই। কিন্তু তার গলার স্বর এক পর্দা নেমে গেছে তখন। সুন্দর চেহারার রাখোহরির মুখে সর্বদা যে নিষ্ঠুরতা এবং আত্মবিশ্বাস ফুটে থাকত তার সামনে অনেকেই দাঁড়াতে পারত না। নিতাই জানত, বউ গেলে সে আটকাতে পারবে না। অথচ তার দুধেল গাই। তারই ওপর খেয়ে-পরে আছে তারা, টেরিলিন-টেরিকটন পরছে, সিগারেটের ব্র্যান্ড পালটেছে। বউয়ের কাজকর্মে পাছে বাধা হয় সেই ভয়ে

বাচ্চাকাচ্চা হতে দেয়নি। এখনও কেমন আঁট গড়নের লম্বা ছিপছিপে মেয়েটি রয়ে গেছে বউ। পুরুষদের বাতাসে ভাসিয়ে রাখে। কিন্তু হঠাৎ এ কী? এমনটা তো কখনও ভাবেনি নিতাই!

রাখোহরি কঠিন মুখ করে বলল, কী আর খারাপ কাজটা করছি! একটা মেয়েকে নষ্ট করছ তোমরা। আমি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। তাকে সত্যিকারের ঘরসংসার দেব।

ও সব ব্লাফ। আপনি ওকে নিয়ে গিয়ে বাজারে ছেড়ে দেবেন। আমি জানি।

জানো যদি তো ওকে সেটা বুঝিয়ে দাও না কেন?

কিন্তু নিতাই যে তা অনেক বুঝিয়েছে, এবং বউ বুঝতে চায়নি, তা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল। হঠাৎ হম্বিতম্বি ছেড়ে নিতাই রাখোহরির পা চেপে ধরল, দাদা, দয়া করুন।

রাখোহরি তখন তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল।

ক'দিন পর জমির মামলা দায়ের হলে নিতাই রাখোহরির পক্ষে সাক্ষী দেয়। পাড়ার লোকদেরও সে-ই বোঝায়। উচ্ছেদের নোটিশ পড়ার আগেই তারা বাড়ি ছেড়ে কসবার দিকে উঠে গেল। একটা শ্বাস ছেড়ে আর একটু বুড়ো হয়ে গেলেন বগলাপতি। রাখোহরি বাড়ির প্লাস্টার ফেলে নতুন সিমেন্ট লাগিয়ে রং করে নিল। তারপরই বিয়ে করে রাখোহরি অন্য কাজে মন দেয়। বাড়িটা ভাড়া দেয় এক বুড়ো ব্যাচেলারকে।

এই সেই বাড়ি। দুখানা টিনের ঘর, সাড়ে চার কাঠা জমি। তেমন কিছু না। তবু গৌর মনে মনে আজও বাহবা দেয় রাখোহরিকে। বগলুর ফোর সাইট ছিল, রাখোহরিরও ছিল। রাখোহরির পোবা ভূতগুলোই যেন তাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে বালিগঞ্জের বাড়ি একদিন মর্টগেজ যাবে! তাই আগে থেকেই খালাস করে রেখেছিল এই বাড়িখানা। বুড়ো ব্যাচেলার ভাড়াটে বসিয়েছিল, যাতে তুলে দিতে কষ্ট না হয়। বাড়িখানা কাজে লেগেছিল বটে। আবার কাজ ফুরালে রাখোহরি উঠে গেছে বালিগঞ্জে। জঙ্গলে, লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটাতে

একা পড়ে আছে গৌর! মাঝে মাঝে সে ভাবে, বোধহয়। বাড়িখানা তারই হয়ে গেল, রাখোহরি স্বত্ব ছেড়েই দিল বোধহয়। কিন্তু ঠিক বিশ্বাস হয় না। রাখোহরির পোষা ভূতগুলোর কথা মনে পড়তেই আজও রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায় গায়ে। কোন কায়দায় যে রাখোহরি কাকে উচ্ছেদ করবে বলা যায় না। এইসব ভেবে গৌরের কেবলই মনে হয়, এই দুনিয়াতে একটা জীবন সে পরের ঘরে বাস করে যাচ্ছে। কোথাও তার নিজের ঘর নেই। পাখিদের মতো মানুষের পালক নেই যে উড়ে গেলেও দু'-একটা পালক পড়ে থাকবে। কিন্তু গৌরের মনে হয়, পালক নয়, কিন্তু পালকের মতোই হালকা মিহি নরম কী যেন সব পড়ে আছে বাড়িটাতে। হাওয়া দিলে সেগুলো উড়ে উড়ে বেড়ায়। চোখে দেখা যায় না, কিন্তু গৌর ঠিক টের পায়। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে এক-একদিন দেখে, জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে বিছানা ভাসিয়ে দিচ্ছে। সেই জ্যোৎস্নার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে হঠাৎ দেখতে পায়, হালকা কুয়াশার মতো কী যেন ভেসে আছে। ঘুরছে ফিরছে উঠছে নেমে আসছে। এ সব কী তা সঠিক জানে না গৌর, তবে তার মনে হয়, এ সব হচ্ছে মানুষের অদৃশ্য পালক। যেখানে কিছুদিন বাস করে মানুষ, সেইখানে তার কথার স্বর বাতাসে থেকে যায়, থাকে কামনা বাসনার ছাপ, ইচ্ছে-অনিচ্ছে থেকে যায়। সেসবই হালকা মিহিন পালকের মতো ঘোরে ফেরে, বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ইট কাঠ মেঝের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য গাছের মতো শিকড় দিয়ে আঁকড়ে থাকে। তাড়ানো যায় না। হরিরাম কাকা, নিতাই, তার বউ, মাধু, সতু, সেই বুড়ো ব্যাচেলার ভদ্রলোক, রাখোহরির ছেলে বউ, সকলেরই পালক পড়ে আছে। সেইসব পালক গৌরের শ্বাসের সঙ্গে বুকে ঢুকে যায়, চোখে আঁষের মতো জড়ায়। প্রজাপতির মতো কাধে বা মাথায় বসে ডানা কাপায়।

দুনিয়াভর ভূতের খেলা চলেছে। সবাই দেখে না। গৌর দেখে। এই যে এখন দিনদুপুরে জামরুল গাছের ছায়ায় চেয়ার টেনে বসে আছে গৌর, তার চারদিকে অফুরান রোদ, এর ভিতরেও সেইসব পালকেরা উড়ে উড়ে ঘুরছে। দেখা যায় না, কিন্তু টের পাওয়া যায়। হালকা, মিহি। জ্যোৎস্নার মতো, সুখের স্বপ্নের মতো পলকা জিনিস দিয়ে তৈরি। চারদিকে এইসব মানুষের পালক উড়ছে, টের পায় গৌর। তার হাই ওঠে। কেবলই মনে হয়, পৃথিবীতে তার নিজের বলতে কিছু নেই আর। বগলাপতি যা রেখে গিয়েছিলেন তার কিছু

নিল রাখোহরি, আর যা আছে তা ভূতের কজায়। আরও আছে রাখোহরির ভূত। কখন যে সে কাকে উচ্ছেদ করে তার কিছু ঠিক নেই।

বেলা ন'টায় চড়া রোদ উঠে গেছে। পিপড়ের সারি নেমে আসছে গাছ বেয়ে। সকালটা বড় সুন্দর। গৌর গুনগুন করে একটা ইংরিজি প্রার্থনাসংগীত গাইতে থাকে। ফাদার ইভান্স গাইতেন প্রার্থনার গান। সেন্ট অ্যান্টনিজের প্রকাণ্ড হলঘরে পিয়ানোর ঢাকনার ছায়ায় ফাদার ইভান্সের মগ্ন মুখখানা চোখে পড়ে। বুড়ো মানুষ, বড় নরম মুখখানা তার। ধর্মসংগীত ছিল তার প্রাণ। জিশুর কুশবহনের দিনে তিনি বিষাদসংগীত গাইতে গাইতে কাঁদতেন। জিশুর পুনরুত্থানের দিন তার গলায় রৌদ্র ঝিলমিল করত। হুল্লোড়বাজ অত ছেলের মধ্যে কোন ছেলেটার মুখে আনন্দ নেই, মনে নেই। সুখ, তা ঠিক খুঁজে বের করতে পারতেন ফাদার ইভান্স। ভিড় ঠেলে পথ করে আসতেন তার কাছে, কাঁধে হাত রাখতেন, গল্প বলতেন। টাইফয়েডের ঘোরলাগা অবস্থায় কতদিন গৌর দেখেছে শিয়রের কাছে বুড়ো-সুড়ো সান্তাক্লসের মতো ফাদার ইভান্স বসে আছেন। বাদামি দাড়ির ভিতরে হাসি, ঘন নীচে স্বচ্ছ জলের মতো চোখ। সেই জলের নীচে কৌতুক খেলা করে মাছের মতো। বাগানের গোলাপটায় সুন্দর একটা জামা একবার ছিড়ে ফেলেছিল গৌর। তার কান্না দেখে ফাদার ইভান্স, 'অ্যাও, কাডে টো মেয়েরা। টুমি মেয়ে নাকি?' বলে তার জামা খুলে নিপুণ হাতে রিপু করে দিয়েছিলেন। তারপরও বহুকাল জামাটা পরেছে গৌর।

খুব বুড়ো হয়েছিলেন ফাদার ইভাল। তাই একদিন মারা গেলেন। অল্প অল্প বৃষ্টি ছিল সেদিন। ছায়াচ্ছন্ন দিন। ইভান্সের দেহ বহন করে আনল বাহক বন্ধুরা। কালো পোশাক, গম্ভীর মুখ সকলের। শব-বহনকারী গাড়ির পিছনে সেন্ট অ্যান্টনিজের ছাত্রদের বিরাট সারি। নিঃশব্দে তারা ধীরগতি গাড়ির পিছনে পিছনে হাঁটছিল। তাদের সঙ্গে হাঁটছিলেন ফাদারেরা। সাহেবরা কাদে না। গৌরের পাশেই ছিলেন ফাদার ফ্রান্সিস। সে অনেকবার মুখ তুলে ফাদারের মুখখানা দেখল, গম্ভীর মুখ, কিন্তু কান্নার চিহ্ন নেই। কাঁদতে কাঁদতে গৌরের বুকে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল সেদিন। ছিট ছিট বৃষ্টির জল ধুয়ে দিচ্ছিল তার মুখ। ফাদার ফ্রান্সিস তার হাত ধরে রাখলেন। কবরখানায় যখন ফাদারের দেহ রাখা হল গর্তে,

ঝুরঝুরে মাটি চাপা পড়তে লাগল কফিনে, তখনও ফাদারেরা কেউ কাঁদে না। সাহেবরা কাদে না, গৌরের মনে হয়েছিল। যখন গর্তটা প্রায় ভরাট হয়ে এসেছে, ছাত্ররা এগিয়ে গিয়ে মুঠো মুঠো মাটি দিচ্ছে করে, তখন গৌর হঠাৎ দেখে, একটা ভয়-পাওয়া ছোট্ট ব্যাং লাফিয়ে পড়েছে কবরে। বেরোবার পথ পাচ্ছে না। চারদিকে ভিড়। মাটির চাপ এসে পড়ছে তার ওপরে, সে প্রাণপণে লাফ দেওয়ার চেষ্টা করছে, সরে যাচ্ছে এদিক ওদিক, কিন্তু তবু চতুর্দিক থেকে মাটির ঢেলা এসে পড়ছে। ব্যাংটা প্রায় চাপা পড়ে-পড়ে। সেই সময় গৌর দেখল, ফাদার ফ্রান্সিস হাঁটু গেড়ে বসলেন কবরের ধারে, দু'হাত বাড়িয়ে ব্যাংটাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন। দীর্ঘকায় ফাদারের শরীরটা নুয়ে আছে ফাদার ইভান্সের কবরের ওপর, চারদিক থেকে মাটির চাপড়া এসে পড়ছে তার বাড়ানো দুই হাতে, মেঘের ঘন ছায়ায় ফাদার ফ্রান্সিসের মায়াময় মুখখানা কী গভীর বিষন্ন দেখাচ্ছিল! আজও গৌরের মনের মধ্যে ওই ছবিটা রয়ে গেছে, ফাদার ফ্রান্সিস কুঁজো হয়ে কবরের ভিতরে একটা বিপন্ন ব্যাংকে তুলে আনার চেষ্টা করছেন গভীর মমতায়। সেই সময়ে নতমুখ ফাদারের চোখ থেকে অবিরল জল ঝরে পড়ছিল। তার অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাতের তেলোয় ছোট একটা তুচ্ছ ব্যাং প্রাণভয়ে বসে আছে। গৌর দেখেছে।

ফাদার ইভান্সের শেখানো ধর্মসংগীত গুনগুন করে গাইতে গাইতে গৌর ওঠে। কতকাল ধরে মানুষ কত পালক ফেলে গেছে পৃথিবীতে। শিমুল তুলোর মতো ওড়াউড়ি করে সব পালকেরা। গৌর আপনমনে হাসে। ধর্মসংগীত গায়।

উকো দিয়ে গভীর মনোযোগে একটা পিস্টন রিং ঘষছিল গৌর। এখনও তার ঠোঁটে ধর্মসংগীত। সেই সময়ে নন্দীদের বাড়ির মেয়েটা এক কাপ চা নিয়ে এল। সঙ্গে দু'খানা বিস্কুট।

কী খবর?–গৌর আলগাভাবে জিজ্ঞাসা করে। মেয়েটার গড়ন বেশ। বয়সকালের লকলকে ভাব শরীরে ফুটে আছে। পিছল চামড়া। তেমন সুন্দর কিছু নয়। তবু চোখের দীর্ঘ পাতায় একটা শীতলতা আছে। তাকিয়ে থাকলে জিরোতে ইচ্ছে করে।

চা দিয়েই মেয়েটা চলে গেল না। বলল, গৌরদা, আজ বেরোবেন না?

বেরোব।

কখন?

এই তো। বেরোলেই হয়।

আমি আর মা একটু কালীঘাটে যাব। নিয়ে যাবেন?

চায়ে চুমুক দিয়ে গৌর মনে মনে একটু হাসে। বলে, কালীঘাটে গিয়ে কী হবে?

মেয়েটা বলে, মা পুজো দেবে। মানত আছে।

ও আচ্ছা, নিয়ে যাব।

মেয়েটা ঘুরে ঘুরে ঘরখানা দেখে। তারপর হঠাৎ গৌরের দিকে ফিরে বলে, জিজ্ঞেস করলেন না কীসের মানত?

কীসের?

মেয়েটা আঁচল তুলে মুখে চাপা দিয়ে হাসে। তারপর আঁচল সরিয়ে মুখখানা থমথমে করে বলে, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তো, তাই।

ও। তা কোথায় ঠিক হল?

মেয়েটা থমথমে মুখেই বলে, সব কি বলতে আছে?

কেন, বলতে নেই কেন?

ভাংচি দেন যদি!

ভাংচি দেব? কেন?

অনেকে তো দেয়।

গৌর ঠিক বুঝতে পারে না। ফাদার ইভান্সের ধর্মসংগীতের মধ্যে ডুবে ছিল সে, দুনিয়াময় মানুষের ফেলে যাওয়া পালক দেখছিল। সেই ডুবজল থেকে মুখ তুলে হঠাৎ পৃথিবীর ওপরকার সব কথাবার্তা, সম্পর্ক কিংবা ঘটনা বুঝতে তার একটু কষ্ট হয়। মেয়েটার মুখচোখে রহস্য ফুটে আছে। চোখে সজল বিদ্যুৎ, ঠোঁটে টেপা নিষ্ঠুর হাসি। মেয়েটা হঠাৎ পালটে গেল যেন এইমাত্র। গৌর তা লক্ষ করে। কথাটা ঠাট্টা ভেবে সে একটু হাসে। বলে, ভাংচি দেব না।

এই মেয়েটাকে দিয়ে চা আর কুঁচো নিমকি পাঠিয়ে গৌরের এক হাত জমি এনক্রোচ করেছিল নন্দীরা। গৌরের সেই কথা মনে পড়তে একটু হাসল। মেয়েটা কি তা জানত? ঠিক বোঝা যায় না। হয়তো মেয়েটা জানত, হয়তো জানত না। এই জমির জন্য লড়াকু রাখোহরি কত কী করেছিল, আর গৌর কুঁচো নিমকি চিবিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে একটা বয়সকালের মেয়ের দিকে কয়েক পলক তাকানোর সুযোগ পেয়ে সেই দুর্লভ জমির এক হাত ছেড়ে দিয়েছে। এক হাত বাই চল্লিশ হাত, কত হয়? একটু ভাববার চেষ্টা করল গৌর। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। সতেজ গাছের মতো ডালপালা সমেত মেয়েটা। গৌরের, ফিফটি পার্সেন্ট হাফ-ফিনিশ, বগলুর তিন নম্বরের, ল্যান্ডমাস্টারে চড়েই হয়তো একদিন এর বর আসবে।

মেয়েটা কী যেন বলবে বলবে করে। বলে না। পিস্টন রিংটা হাতে ধরে থেকেই গৌর চেয়ে থাকে।

মেয়েটা একটু দম ধরে থেকে হঠাৎ চোখ বুজে বলে, আপনি আমার বিয়েতে ভাংচি দিলে আমি খুশি হতাম।

অ্যাঁ! - গৌর ভারী অবাক হয়।

কিন্তু মেয়েটা দাঁড়ায় না। কথাটা বলেই বাতাসে ভেসে তর তর করে চলে যায়।

যেখানে মেয়েটা দাঁড়িয়ে ছিল সেই শুন্য জায়গাটায় অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে গৌর। ঠিক বুঝতে পারে না কথাটা। কিন্তু বুঝবার চেষ্টা করে খুব। পিস্টন রিং আর উকোটা রেখে দেয় গৌর। জানালার ওপর একটা নিমডাল ঝুঁকে পড়েছে। নতুন বর্ষায় পাতা এসেছে তার। সতেজ পাতা। তাতে রোদ পড়ে সবুজ আলো দিচ্ছে চারধারে। পোকামাকড়ের আনন্দের শব্দ ওঠে চারদিকে। একটা কেন্নো জানালার শিক বাইছে। গৌর জানালায় দাঁড়িয়ে এইসব দেখে আর দেখে। সতেজ নিমগাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে ওই দুরের মেঘহীন আকাশ দেখা যায়। ওইখানে ফাদার ফ্রান্সিস থাকেন, আর ফাদার ইভান্স। স্বপ্নের শিশুরা। লাল নীল বল। চারদিকে ওড়াউড়ি করে মানুষের ফেলে যাওয়া পালক। গৌর চেয়ে থাকে। মেয়েটার কথাটা বুঝবার চেষ্টা করে।

হাতের তেলকালি ঝাড়নে মুছে গৌর তার শোওয়ার ঘরে আসে। পেরেকে ঝোলানো হাত-আয়নাটা পেড়ে নেয়। মুখ দেখে। চোয়াড়ে একখানা মুখ। রুখে-শুখে দুখানা হাত-পা। স্থাবর অস্থাবর কিছুই নেই গৌরহরির। যা আছে সবই ভূতের কজায়। রাখোহরি চোয়ালে থাপ্পড় মেরে কেড়ে নিতে চায় যদি, গৌর ঠেকাতে পারবেনা। ভূতের খেলায় রাখোহরি বড় ওস্তাদ। মাথাটা এক বেহদ্দ নাচুনে মাগির নাটমঞ্চ। গৌর নিজের মুখের দিকে চেয়ে থাকে আয়নায়। তবু সে বিয়েতে ভাংচি দিলে মেয়েটা খুশি হয়। আরে বাঃ। এর অর্থ কী? মানে কী?

জানালা দিয়ে মেঘভাঙা রোদ এসে পড়েছে। চারদিক আলোয় আলোময়। এমন দিনে কিছুই অস্বচ্ছ থাকে না। গৌর ভাবে, এমন সুন্দর দিন বহুকাল দেখেনি সে। কিন্তু কী বলল মেয়েটা? গৌর ভাংচি দিলেই খুশি হয়? না কি যে কেউ ভাংচি দিলেই খুশি হয়? কোন কথাটার ওপর জোর দিল মেয়েটা, 'আপনি' না 'ভাংচি'? ঠিকঠাক বুঝতে পারে না সে। কিন্তু ভাবে। চারদিক থেকে মেঘভাঙা রোদ এসে তাকে ঘিরে ধরে। চড়াই পাখিরা উড়ে আসে ঘরে। আসে এক-আধটা মৌমাছি, ফড়িং। পিপড়েরা দেয়ালে বায়, কেন্নো

আসে, সবুজ পোকা একটা জানালার শিক বেয়ে ওঠে। ভেজা জঙ্গলে রোদ পড়ে একটা বুনো মিষ্টি গন্ধ ছড়াতে থাকে।

বেলা সোয়া দশটা নাগাদ গৌর বুঝতে পারে, মেয়েটা তাকে ভালবাসে। কী করে বাসল, কবে বাসল তা ভেবে দেখতে আরও সময় লাগবে। কত সময় তা ঠিক জানে না গৌর। হয়তো একটা জীবনের সময় লেগে যাবে। তা লাগুক। একটা লম্বা জীবন এখনও পড়ে আছে গৌরের। সেই একা নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য কিছু কিছু সুন্দর প্রবলেম থেকে যাক। গৌর অবরে-সরে বসে ভাববে।

দরজায় চাবি দিয়ে গৌর বেরোয়। গাড়ি বের করে হর্ন দিতে থাকে। হর্নটা আজ অন্যরকমের আওয়াজ ছাড়ে। ভোরবেলার অস্বচ্ছ আলো দেখে আনন্দে বিস্ময়ে মুরগি যেমন ডাকে।

৪. বিয়ের দিন

বিয়ের দিন দমদম থেকে বর আনল গৌরহরি। বউবাজার থেকে ফুলের মালায় সাজিয়ে নিয়েছিল গাড়ি। সেই ফুলের গন্ধে গাড়ির ভিতরকার চৌকো বাতাসটা টইটম্বুর হয়ে রইল। বেশ লাগছিল গৌরের।

সন্ধে লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। আসরে উকি মেরে গৌর একবার মেয়েটাকে দেখে নিল। চন্দনে, সিঁথিমৌরে, গয়নায়, বেনারসিতে, ফুলে মেয়েটাকে চেনাই যায় না। মাইকে সানাই বাজছিল বুক খালি করে দিয়ে।

শেষ ব্যাচে খেয়ে গৌরকে বারকয়েক ট্রিপ দিতে হল আত্মীয়-স্বজনদের যে যার ডেরায় পৌছে দিতে। দু' খিলি পান গ্লাভস চেম্বারে রেখে দিয়েছিল। শেষ ট্রিপটা মেরে ফেরার পথে লেকে জলের ধার ঘেঁষে গাড়ি দাড় করিয়ে পান মুখে দিয়ে সিগারেট ধরাল গৌর। জলে আলো ভাঙছে। নানারকম আলো। জোর বাতাসে জলের গন্ধ আসে। শব্দ আসে। ফুলের মালাগুলি বাতাসে শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শুকোবার আগে শেষ তীব্র সুবাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। গাড়ির ভিতরে সেই গন্ধ ভার হয়ে থাকে গৌরের বুকে। এক-একটা ঝিমুনি চমকে আবার জেগে যায়।

কী বলেছিল মেয়েটা? কী যেন! আপনি আমার বিয়ের ভাংচি দিলে খুশি হতাম। আরে বাঃ! গৌর ঘুম-ঘুম চোখে ভাবে। কথা ক'টা নেশারু ওম এনে দেয় চারধারে। এমন স্বার্থহীন ভালবাসার কথা তাকে কেউ কখনও বলেনি। মেয়েটার যে বর জুটছিল না এমন নয়। চা আর কুঁচো নিমকি দিয়ে এক হাত বাই চল্লিশ হাত জমিও তারা পেয়ে গেছে। তবে আর ওই কথা বলার কী স্বার্থ ছিল তার? না কি ঠাট্টা করেছিল? তাও নয়, গৌর একা একা মাথা নাড়ে। কথাটা কুঁচো নিমকি আব চা-কে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এক হাত বাই চল্লিশ হাত জমির স্বার্থত্যাগও তার কাছে লাগে না। বিয়ের চিত্রিত পিড়ির দিকে

এক পা বাড়িয়েও কীরকম দীর্ঘশ্বাস তার! সে তো কখনও কিছু বলেনি গৌরকে আগে! বললেও লাভ ছিল না অবিশ্যি। হাফ-ফিনিশ গৌরের মূর্তিখানা পুরো গড়া হয়নি যে। তার অর্ধেক দুনিয়া ভূতের কজায়, বাকি অর্ধেক সে এক দুলদুলে মিহিন বোটায় দুলছে। কখন ছিড়ে পড়ে কে জানে! মেয়েটা সবই জানত। তবু এই কথাটা বলে চিরকালের মতো চলে গেল।

চলে গেল বলে অবশ্য গৌরের কোনও ক্ষতি নেই। মেয়েটার জন্য তার দুঃখ হয় না। বরং যতবার সেই কথাটা মনে হয় ততবার আনন্দে গৌরের গা কেমন করে। ওই কথাটুকুর মধ্যেই রয়ে গেল গৌরের মুখে চন্দনের ফোঁটা, গলায় মালা, মাথায় টোপর। গৌরের আর কী চাই! জীবনে। এরকম অনেক রহস্য থেকে যায়, যার সমাধান মানুষ চায় না। ওরকম '-একটা রহস্য থেকে যাক। বাংলাদেশে ঝড়তি-পড়তি মেয়ের অভাব নেই। গৌরের আছে চালু ল্যান্ডমাস্টার, সাড়ে চার কাঠা জমি, এখনও দু'খানা ভাল হাত-পা রয়েছে তার। এর জোরে গলা বাড়ালে কেউ কেউ এখনও মালা দেয়। কিন্তু অমন স্বার্থহীন কথা কেউ শোনাতে পারে না।

এক গভীর আত্মপ্রসাদে, আনন্দে তার মনের আনাচে-কানাচে আলো এসে পড়ে। বাতাস বয়। দুটো রুখে-শুখো হাত-পা, মাথায় নাচের শব্দ, হাফ-ফিনিশ গৌর তার ভুতুড়ে ল্যান্ডমাস্টারের সিটে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে লেকের বাতাসে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে নানারকম সুন্দর স্বপ্ন দেখে সে।

পরদিন আবার কলকাতার সোয়ারি এধার ওধার করতে বেরোয় গৌর।

.

কলকাতার সোয়ারিরা ট্যাক্সি-ট্যাক্সি' বলে ডাকে। গৌরের গাড়ি থামে। মিটার ঘোরে। সোয়ারি খালাস হয় আবার। তখন গৌর মাঝে মাঝে আয়নাটা মেপেজুখে ঘুরিয়ে রাখে। পিছনের ফঁকা সিটখানা দেখা যায়। সেই সিটে মাঝে মাঝে নন্দীদের মেয়েটাকে বসে

থাকতে দেখে গৌর। তার কল্পনার মেয়েটা আরও সুন্দর হয়। ক্রমে ক্রমে আরও সুন্দর হয়ে উঠতে থাকে। চোখে চোখ পড়ে। কেউ চোখ সারায় না। গৌর বিড়বিড় করে বলে, আরও সুন্দর হও, আরও আরও সুন্দর। মেয়েটা সুন্দর হতে থাকে। তার বাদামি চামড়ায় দুর্লভ গোলাপি রং ফুটে ওঠে, চোখের তারা হয়ে যায় আকাশি নীল, চুলে ভোরের আলোর সোনালি আভা এসে লাগে, ঠোঁট তরমুজের মতো লাল। আবার তার চেহারা পাল্টে ফেলে গৌর। গায়ের চামড়া বাদামি, চুলে মধুর মতো রং, চোখ সমুদ্রের মতো সবুজ...

ডেডবটিটা মাঝে মাঝে মচ করে নড়ে ওঠে। গৌর ধমক দিয়ে বলে, চোপ! নো ইন্টারফিয়ারেন্স ইন লাভ...নো ইন্টারফিয়ারেন্স...বলতে বলতে গৌর হাসে। তার মনে হয়, লম্বা সুতো ছেড়ে যেমন উলের বল গড়িয়ে যায় তেমনই নন্দীদের মেয়েটার সেই কথাটা গড়িয়ে আসছে। আসছে তো আসছেই। যতদূর যাবে গৌরহরি, বগলুর ব্যাটা, ততদূর যাবে। সেই সুতোর একপ্রান্তে বসে মেয়েটা বুনে যাচ্ছে একখানা সোয়েটার। সেই সোয়েটারের ডিজাইনের পরতে পরতে গৌরহরির নাম লেখা হয়ে যাচ্ছে।

সোয়ারিরা মুখ বাড়ায় জানালায়।

কোথায় যাবেন? গৌরহরি জিজ্ঞেস করে।

সোয়ারিরা কত নাম বলে। টেরিটিবাজার, হাটখোলা, মুর্গিহাটা, হাওড়া। সেইসব নাম লোহার পাতের মতো গৌরের চারধারে একখানা শক্ত জাল বুনতে থাকে। ছেলেবেলায় সার্কাসে গৌর মৃত্যুকূপের যে খেলা দেখেছিল, তাতেও ছিল ওইরকম মজবুত একখানা জাল। ভিতরে দু'খানা। মোটরসাইকেল গোঁ গোঁ করে ঘুরত ফিরত, ল্যান্ডমাস্টার তেমনই কলকাতার চারধারে জালে আটকে ঘোরে ফেরে। বাইরে যায় না।

বিকেলের দিকে মৌতাত জমে ওঠে ঠিক। সেইসময়ে কলকাতার রাস্তাঘাট মুছে গিয়ে কে যেন খাল নদী নালা কেটে রেখে যায়। কোথা থেকে জলধারা এসে কুলকুল করে বইতে থাকে। স্টিমলঞ্চ যায় আসে। বয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে টালমাটাল জল-পুলুস ট্রাফিক

সামলায়। ঢাকার কামান দুর থেকে রঙিন গোলা ছুঁড়ে মারে। তখন ফাদার ফ্রান্সিস তার স্বপ্নশিশুদের নিয়ে মাটির কাছাকাছি চলে আসেন। গৌরহরির দিকে ছুঁড়ে দেন সেই বল, ফ্যাস...ফ্যাস দি বল, গৌর... গৌর হাত বাড়ায়। ধরতে পারে না। ফাদার হেসে কুটিপাটি হন। মাঝে মাঝে গাভীর ডাক শোনে সে। ট্রাফিক পুলিশ কৃষ্ণের মতো দাঁড়ায়, হাতে আড়বাঁশি, পা দুখানা ক্রশ করা। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে আটক গাড়িগুলো তখন গাভী হয়ে ডাকতে থাকে।

সন্ধে হয়ে আসে। কলকাতার অন্ধকারে নিয়োন সাইন দপদপিয়ে জ্বলে ওঠে। ভারী অবাক হয়ে গৌর দেখে সেইসব নিয়োন সাইনে নন্দীদের মেয়েটার সেই কথা ক'টা জ্বলে জ্বলে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার হাওয়া দেয়। সেই বাতাসে ফিসফিস ভেসে আসে সেই কথা। কলকাতার রাস্তায় একা বকুলগাছ যখন অন্ধকারে তার বকুল ঝরায় তখন সেই পতনশীল বকুলের শব্দে গন্ধে সেই কথা জীবন্ত হয়ে ওঠে।

সময় বয়ে যায়। অনেক সময় বয়ে যায়। তবু সেই উলের বল গড়িয়েই আসে। দীর্ঘ সুতো পড়ে থাকে। যতদূর যায় গৌর, ততদূর গড়ায় উলের বল। যতদূর যাবে গৌর, ততদূর গড়াবে। সুতো দীর্ঘ থাকবে। ফুরোবে না।

.

বর্ষাকাল আর খুব দূরে নয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। ওয়াইপার প্রাণপণে ঘোরে উইন্ডস্ক্রিনে। বৃষ্টির ঝরোখা দিয়ে এক ভিন্ন শহরের মায়াময় সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। গৌরের শ্বাসের ভাপ বন্ধ কাচের গায়ে লেগে মুছে যায়। বৃষ্টি থামলে চারদিকে অপরূপ জলছবি। জলে ছায়া আর রোদ ভাঙে। গাছে গাছে ঝালর ঝোলে।

মুর অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে দুপুরবেলা গাড়ি থামিয়ে গৌর দেখে, রাস্তার ধারে ভিড়। ঢোলকের শব্দ হচ্ছে, আর মলের শব্দ। গৌর হাই তুলে গ্লাভস চেম্বার থেকে পুরনো লটারির টিকিটটা বের করে নম্বর দেখে। মেলেনি, তবু টিকিটটা হেঁড়েনি সে, রেখে

দিয়েছে। কতকিছু রেখে দেয় মানুষ। টিকিটটা মমতাভরে আবার জায়গায় রেখে সে হাই তোলে। ঘুম পাচ্ছে। আঙুল মটকায় সে। পেট্রলের গন্ধ জমে আছে গাড়ির ভিতরে। ঘোলা বাতাসে শ্বাস নিতে বাইরে আসে গৌর। তারপর পায়ে পায়ে ভিড়টার দিকে এগোয়।

খুনখুনে এক বুড়ি ঢোলক বাজাচ্ছে। দুলে দুলে। চমৎকার হাতের কারুকাজ তার। একবারও ভুলভাল টোকা পড়ে না। গমকে গমকে ঢোলকের শব্দ ছিটিয়ে দেয় বুড়ো লোল হাতে। ভিড়ের মাঝখানে একটু ফাঁকা চত্বর। সেইখানে বাসন্তী রঙের ঘাঘরা দুলিয়ে গোলাপি রুমাল হাতে একটা মেয়ে নাচছে। তার চোখে কাজল, কপালে টিকলি, নাকে বেসর। দেহাতের গমখেতের উদাসীনতা তার মুখে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই মুখে মেঘ করে। বিদ্যুৎ চমকায়। পায়েব বোল ফুটিয়ে মেয়েটা ঘুরে যায়, ঘুরে-ঘুরে যায়। হেলে দোলে কাপে। চোখের পাতা নাচায়। তার একটু ভোতা নাকের নীচে ফোঁটা ফেঁটা ঘাম। উত্তোলিত বাহুর নীচে বগলের জামা জুড়ে স্বেদচিহ্ন। দুই সবল পায়ে ফিনফিনে শরীর সে কোন অদৃশ্য লেত্তিতে জড়িয়ে ছেড়ে দেয়। মাতালের মতো ঘোরে। তার পুরুষ সেই সুন্দর দেহাতি যুবা মাঝে মাঝে চরকিবাজি লাফ দিয়ে উঠে মেয়েটার সঙ্গে দু চক্কর নাচে। চারদিকে ভিড়েব দিকে তাকিয়ে সে চোখের ইশারা করে। ভিড় জমলে সে তার বাজির ছোরা বের করবে, দেখাবে লাঠির খেলা, কাঠির ওপর পিরিচ ঘোরানো, হেঁটমুণ্ড হয়ে পায়ের ওপর ঢোল নাচাবে। মেয়েটা তখন ক্লান্ত মুখে জনে-জনের কাছে যাবে মাঙতে।

গৌর দাঁড়িয়েই থাকে। শুখো পায়ের ওপর শরীরটা বেঁকে থাকে তার। রুখো হাতখানা পকেটে ঢোকান। পুরুষটা তার বাজি শুরু করে। তিনখানা চারখানা পাঁচখানা ছোরা একে একে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়। লোফে, ছুঁড়ে দেয়। ছোরাগুলো রোদে ঝিলিক খেয়ে ওঠা নামা করে শূন্যে। মেয়েটা ঝম করে এক পা ফেলে, আবার ঝম করে অন্য পা। জনে-জনের কাছে ঘুরতে থাকে।

ক্রমে এগিয়ে আসে মেয়েটা। ভিড়ের মধ্যে গৌরের দিকে হাত বাড়ায়। প্রত্যাশার চোখে তাকায় গৌরের মুখে। চিনতে পারে না। গৌর তো ভিড়ের একজন, চিনবে কী করে?

গৌর তার রুখো হাতখানা বের করে আনে, সেই হাতে একটা সিকি মেয়েটার চোখের সামনে তুলে ধরে। তারপর কোষবদ্ধ হাতে সিকিটা ফেলে দেয়। মেয়েটা হাতখানা দেখে। হাত থেকে চোখ সরে আসে মুখে। ঘোলা জল কেটে যায়। চিনি-চিনি করে মেয়েটা চিনতে পারে গৌরকে। একটু হাসে। আশপাশের লোকজন একমনে বাজি দেখে। লোকটা তখন আশ্চর্য নিপুণতায় দুই হাতে চারটে কাঠিতে চারটে পিরিচ বন বন করে ঘোরায়। গৌর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, কী খবর?

মেয়েটা আঁচলে মুখের ঘাম মুছে বলে, ভাল। কাল আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি।

কেন?

এখন চাষবাসের সময়। ফসল উঠে গেলে আবার শীতের শেষে আসব।

আমি তোমার নাচ দেখে নিয়েছি।

কত লোক রোজ তার নাচ দেখে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় খঞ্জনার মতো ক্লান্তিহীন, লজ্জাহীন, ইচ্ছাশূন্য কত নাচ নেচেছে সে। তবু গৌরের কথায় লজ্জা পেয়ে সে রাঙা মুখ একটু নত করে।

তারপর বলে, আবার যখন আসব তখন আবার দেখো। তুমি বড় ভাল লোক।

গৌর চুপ করে থাকে।

মেয়েটা মুখ তোলে। সেই মুখে পড়ন্ত রোদ তার ঝলক তোলে। আনন্দিত মুখখানা। মেয়েটা তীব্র সুখের শ্বাসের সঙ্গে বলে, কাল, কাল আমরা দেশে যাচ্ছি।

কী আছে দেশে?

কিছু নেই তেমন। গঁহু আর ধানের খেত, জল, মাটি, আর কী? শীতের শেষে আবার আমরা আসব। তুমি বড় ভাল লোক।

গৌর হাসে। মেয়েটা হাসে।

মলের ঝম শব্দ হয়। মেয়েটা আর এক পা এগোয়। অপরিচিত পুরুষেরা সামনে হাত বাড়িয়ে দেয়। সেই হাতে মেহেদির নকশা, উল্কি, প্রত্যাশা।

কাল ওরা দেহাত যাবে।

গৌর ফিরে এসে তার ল্যান্ডমাস্টারে বসে।

.

স্থলের গাড়ি জলে ভাসায় গৌর। জলের গাড়ি আকাশে ওড়ায়। তার সেই আশ্চর্য জাদুর খেলা কেউ লক্ষ করে কিনা কে জানে! জলে স্থলে অন্তরিক্ষে অবাধ ঘোরে ল্যান্ডমাস্টার। কখনও কখনও তার পিছনে কাচ দিয়ে দেখা যায় সমুদ্র, জাহাজের নিঃশব্দ মাস্তুল। দূর জাহাজঘাটায় একটা টিলার ওপর ছোট্ট বাড়ি। বন্দরে একটা উঁচু জায়গায় নন্দীদের মেয়েটা একখানা হাত তুলে রাখে। গৌর এইসব দেখে।

ফিসফাস করে গঙ্গার বাতাস বয়ে যায়। মাঝে মাঝে কলকাতা জুড়ে জ্যোৎস্না ওঠে। বটের আঠার মতো জ্যোৎস্না। সেই আলোর নদী বয়ে যায়, গাছপালার ডালপালা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে! সুস্বাদ সুঘ্রাণ সেই জ্যোৎস্নায় মাঝে মাঝে গৌর একটা পুরনো প্রকাণ্ড বাড়িকে মনে মনে খোঁজে। সেই বাড়িটা ভাঙা হয়ে গেছে নাকি! কোথাও গৌর সেটাকে আর খুঁজে পায় না। জানালা দরজার পাল্লা নেই, হা-হা বাতাসে ফাঁকা বাড়িটায় কেবলই ক্ষয় আর পতনের ঝিরঝির ঝুরঝুর শব্দ ওঠে। মিহিন পতনের শব্দ। একটা বন্ধ দরজার ওপাশে টানা দীর্ঘ কষ্টের খাস টানে কেউ। কোথায় অলক্ষে জ্বলে সবুজ আলোর বিজ্ঞাপন, তুমি চাও...তুমি চাও...তুমি চাও...লায়লার রুটি! কোথাও পাওয়া যায় না সেই রুটি। গৌর খুঁজে দেখেছে। কিন্তু আছে স্যর ঘরে। সেখানে সবুজ আলো এসে পড়ে। তখন ঘরখানায় মাঠঘাটের ছবি ফুটে ওঠে।

বৃষ্টি আসে। বৃষ্টির ঝরোখা ঠেলে চলে ল্যান্ডমাস্টার। উইন্ডস্ক্রিনে বিদেশি শহরের ছবি।

সর্বত্রই ওড়ে মানুষের ফেলে-যাওয়া পালক। উড়ে আসে ল্যান্ডমাস্টারের ভিতরে। গৌরের মাথার চারধারে ঘুরে বেড়ায়, শ্বাসের সঙ্গে বুকের ভিতরে চলে যায়। কাঁধে বসে, মাথায় বসে প্রজাপতির মতো ডানা কাপায়।

মলিনের লাইসেন্স কেড়ে নেয় পুলিশ। আবার ফেরত দেয়। নির্বিকার মলিন গৌরের গাড়ির সামনে এসপ্ল্যানেডে গাড়ি ভিড়িয়ে হাই তোলে।

মামু, কী খবর?–গৌর জিজ্ঞেস করে।

মলিন আড়মোড়া ভেঙে বলে, ত্রিভঙ্গ, তোমার গাড়িটা যে রং জ্বলে, চটা উঠে ভারতবর্ষের ম্যাপ হয়ে গেল। মাডগার্ডের লোহা মুড়মুড়ে হয়ে এসেছে। এবার গাড়িটা মল্লিকবাজারে ছেড়ে দাও।

গৌর শ্বাস ফেলে তার ল্যান্ডমাস্টারের দিকে চেয়ে থাকে। কিছুই পৃথিবীতে অজর অমর নয়। গাড়িটা ক্ষয়ে যাচ্ছে ঠিকই। বাবা ল্যাভু, আমরা দুজনেই কি উচ্ছন্নে চলেছি।

.

বিবেকানন্দ ব্রিজ থেকে গঙ্গার শোভা দেখতে দেখতে একদিন গৌর নেমে আসছিল। সকাল দশটা। বালি চৈতলপাড়ার সোয়ারি ছিল, খালাস দিয়ে এসেছে।

দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের সামনের চত্বরে গাড়ি নেমে এলে একজন মেয়েমানুষ হাত তুলল। গৌর গাড়ি থামায়।

কোথায় যাবেন?

কলেজ স্ট্রিট যাব বাবা, নিয়ে যাবে?

পথেই পড়বে। গৌর হাত বাড়িয়ে পিছনের দরজা খুলতে খুলতে একঝলক মেয়েমানুষটাকে দেখে। পরনে লালপেড়ে গরদের শাড়ি, ঘাড়ে আঁচল। কপালে প্রসাদি সিদুর দগদগ করছে। উপোসি মুখখানার শুষ্কতা ভেদ করে পবিত্রতা ফুটে আছে। চোখ দুখানায় ঘোরলাগা সম্মোহিত ভাব। সঙ্গে দাসী, তাদের হাতে ফুল বেলপাতা, সন্দেশের বাক্স, পট, গঙ্গাজলের মেটে কলসি।

গৌর গাড়ি ছাড়ে। কিন্তু মুখখানা চেনা-চেনা লাগে তার। ওই সুন্দর মুখ, কপালে ওড়া চুলের গুছি, গভীর চোখ সে আগেও দেখেছে। তেমন বেশি বয়স নয়, কিন্তু গরদের শাড়ি, সিদুর, উপবাস, সব মিলিয়ে একটা কেমন গম্ভীর পবিত্রতার ভাব মেয়েমানুষটাকে বয়স্কা করে রেখেছে। মনে পড়ি- পড়ি করেও পড়ে না গৌরের।

কপাল থেকে চুলের গুছি সরানোর জন্য হাত তলে মেয়েমানুষটা। কী সুন্দর আঙুল! লম্বা, নিটোল, হলুদ রঙের আঙুল, মুক্তোরঙের পরিষ্কার নখ। চুলের গুছি সরাতে গিয়ে আঙুলগুলি, যেন। বা পিয়ানোর রিডে, সুন্দর আলগোছে নড়ে। আর তখন একটা আংটির হিবে হঠাৎ ঝিকিয়ে ওঠে।

সেই হিরের ঝলকই গৌরের অন্ধকার মাথায় তীব্র আলো ফেলে। মনে পড়ে। হাড়কাটা গলির মতিয়া। এক পলক ঘাড় ঘোরায় গৌর। আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। মতিয়া! মতিয়াই তো! কিন্তু পাউডার লিপস্টিক নেই, নখে পালিশ নেই। সব রং ধুয়ে ফেলেছে সে। দুর্লভ আতরের গন্ধটুকু পাওয়া যায় না। গরদের শাড়ি থেকে মৃদু ন্যাপথলিনের গন্ধ আসে। আর ফুল বেলপাতার গন্ধ। এ কীরকম মতিয়া? আর একবার মতিয়ার কাছাকাছি যাবে, যে বাতাসে শ্বাস ফেলে মতিয়া সেই বাতাসে শ্বাস টেনে নেবে, এরকম একটা ইচ্ছে ছিল গৌরের। আজ এত কাছে বসে আছে সে, গঙ্গাস্নানের পর, উপবাসের পর, রং ধুয়ে-ফেলা মতিয়া, তবু একটুও রোমাঞ্চ হয় না গৌরের। গৌর আয়নার দিকে মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখে। মতিয়ার সুন্দর আঙুল শ্বেতপদ্মের মতো কপালে নড়ে, হিরেটা ঝিকোয়।

সম্মোহিত মুখে মতিয়া হঠাৎ একটু ঝুকে গৌরকে জিজ্ঞেস করে, বাবা, তুমি ওই মন্দিরে কখনও গেছ?

না।

একবার যেয়ো। বড় ভাল লাগবে।

আচ্ছা।

ওখানে স্নান করলে শরীর বড় ঠান্ডা হয়। রামকৃষ্ণদেবের পায়ের ধুলো এখনও ছড়িয়ে আছে। ওখানে। গড়াগড়ি দিলে সেই ধুলো শরীরে উঠে আসে। মানুষের কত জন্ম ধন্য হয়ে যায়। একবার যেয়ো বাবা।

চোখের জল গড়িয়ে নামে মতিয়ার। দুর্লভ ফেঁটাগুলি পড়ে। সেই অঞ্চর চিহ্ন গৌরের ল্যান্ডমাস্টার ধরে রাখে ঠিক। এ সব মানুষের পালক। মানুষ চলে যায়, তার চিহ্নগুলি পড়ে থাকে।

গৌরকে রাস্তা চেনাতে হয় না। সে নিজে থেকেই কলেজ স্ট্রিট ছেড়ে বাঁয়ের গলিতে ঢোকে। নির্ভুলভাবে মতিয়ার বাড়ির সদরে গাড়ি দাঁড় করায়।

ভ্রূ দুটো ওপরে তুলে মতিয়া জিজ্ঞেস করে, তুমি বাবা, আমার বাড়ি চিনলে কী করে?

গৌর একটু হাসে।

মতিয়া লাজুক গলায় বলে, তাহলে আমাকে তুমি চেনো।

গৌর উত্তর দেয় না।

মতিয়া শ্বাস ফেলে বলে, আমি বড় পাপী বাবা। বড় পাপী।

মতিয়া পয়সা দেয়। গৌর নেয়।

আসি বাবা। তুমি বড় ভাল লোক।– মতিয়া বলে।

গৌর চুপ করে ফেরত-পয়সা গুনে দেয়।

মতিয়া জানালায় ঝুঁকে ফিসফিস করে বলে, আমাকে মনে রেখো না বাবা।

কিন্তু তবু গৌরের সবই মনে থেকে যায়। স্থলের গাড়ি জলে ভাসায় গৌর, জলের গাড়ি শুন্যে ওড়ায়। ওড়ে পালক, থাকে আতরের সুগন্ধ, একটা টিকলির নকশা। কলকাতার নিয়োন সাইনগুলিতে কত পুরনো দিনের কথা ফুটে ওঠে! গৌর ভুলবে কী করে?

৫. নাইট শো

অনেক রাতে নাইট শো ভাঙার একটু আগে গাড়িখানা দক্ষিণমুখখা করে দাঁড়িয়ে ছিল গৌরহরি। শশা ভাঙলে যদি গ্যারেজের দিকের সোয়ারি পায়। আসলে এখন অনেক রাতে একা একা গাড়িখানা চালিয়ে নির্জন ঘুমন্ত গ্যারেজটায় যাওয়ার সময়ে প্রায়ই গা ছমছম করে গৌরের। ওই ডেডবডিটা ম্যাক্সিমাম নড়াচড়া করতে থাকে। ও শালাকে ঢিট করার একমাত্র উপায় গাড়িতে সোয়ারি তোলা। তুললেই শালা চুপ। আর নড়াচড়া নেই। তাই অপেক্ষা করছে গৌর। তার রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। পাইস হোটেলে সে খেয়ে নেয়। একটা মিঠে পান খেয়েছে। তারপর রুখো-শুখো দু'খানা হাত-পা-ওলা দুঃখী গৌরহরি আরামে বসেছে স্টিয়ারিঙের পিছনে হেলান দিয়ে। অপেক্ষা করছে। বহু ট্যাক্সি ওইরকম দাঁড়িয়ে। শেষ ট্রিপ যদি পায়। গৌরহরির পয়সার লালচ নেই। গৌরা যেমন কারও সার্ভেন্ট না, তেমনি না পয়সারও স্লেভ! কেবল এক-আধজন সঙ্গী খোঁজে। নিশুত রাতে একটা ল্যান্ডমাস্টারে একা বসে থাকতে তার কেমন একটু লাগে ঠিকই। যখন শালা ডেডবডিটা সবসময়েই রয়েছে সঙ্গে, একটু সাবধান থাকা ভাল। বাঁ দিকে একটা অন্ধকার গলি। সেই গলি দিয়ে একটা তেরো-চৌদ্দ বছরের হাফপ্যান্ট পরা ছেলে মুখ বাড়াল। চারদিক চেয়ে দেখছে। মুখখানা শুকনো। কেমন একটা অস্থির ভাব। পায়ে পায়ে সে গৌরের ট্যাক্সিটার কাছে আসছে। কিন্তু গৌর কারও সার্ভেন্ট নয়। আসুক যে কেউ। গ্যারেজের দিকের সোয়ারি না হলে নেবে না। গৌরহরি অর্থাৎ বগলুর ছাওয়াল গৌরা মনে মনে নিজেকে শক্ত করে রাখে। ছেলেটা ম্লান মুখে কাছে আসে।

ট্যাক্সি যাবে?

কোনদিকে?

ছেলেটা ইতস্তত করে বলে, সাউথে।

আমার গ্যারেজ যাদবপুরে। ওদিকে হয় তো যেতে পারি।

ছেলেটা শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল, ওদিকেই।

তবে উঠে পড়ে। গৌরহরি সরে গিয়ে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মিটার ডাউন করে।

ছেলেটা নরম গলায় বলে, ওই গলির মধ্যে একটু যেতে হবে। মেয়েছেলে রয়েছে।

ঝামেলা! তবু তো সোয়ারি। নাইট শো ভাঙতে এখনও প্রায় আধঘণ্টা দেরি। তার আগেই যদি চলে যাওয়া মন্দ কী?

গলিতে গাড়ি ঢুকবে তো? ঘষা-ফষা লাগে যদি?

লাগবে না। গলি চওড়া।

সাবধানে গাড়িটা বাঁ দিকে ঘুরিয়ে গলিতে ঢোকে গৌরহরি। ছেলেটা পিছনের সিট থেকে সামনে ঝুঁকে বলে, আর একটু এগিয়ে।

কতদূর?

এই সামনেই, কয়েকটা বাড়ি পর।

বিরক্ত গৌরহরি ঘুমন্ত, অন্ধকার গলিটার মধ্যে হেডলাইট জ্বেলে এগোয়। বলে, গাড়ি ঘোরাব কী করে? ওদিকে বেরোবার রাস্তা আছে?

আছে। কোনও অসুবিধে নেই। আমরা তো আছি।

গৌরহরি এগোয়। পাকা হাত তার। আঁকাবাঁকা গলির মধ্যে ঘুরে ফিরে তার গাড়ি যায়।

আর কতদূরে?

আর একটু। বাঁ হাতে আর একটা গলি পড়বে, সেখানে।

ইস! বড় ঝামেলায় ফেললে।

এখন গৌরবাবুর বেড-টাইম নয় ঠিক। তবে মাঝে মাঝে হাই উঠছে। কেন গৌরবাবু নিজের ইচ্ছেমতো ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে না? বিশেষত সে যখন কারও চাকর নয়। কার ধার ধারে সে?

গাড়ি আর খানিকটা এগিয়ে বাঁ হাতের গলিটা পায়।

ওরেব্বাস! এ যে যম অন্ধকার। গলিটাও সরু।

গাড়ি যায়।

যায় যাক। আমি যাব না। এখানে দাঁড়াচ্ছি, তোমায় লোকজন ডেকে আনো। এইটুকু সবাই হেঁটে আসতে পারে।

এইটুকু নয়। গলিটা অনেক লম্বা। একদম ও-প্রান্তে যেতে হবে। তাছাড়া সঙ্গে খুচরো কিছু মালপত্র আছে। চলুন না, মিটারের বেশি দেব।

গৌরহরিকে পয়সা দেখাচ্ছে! অ্যাঁ। পয়সা দেখাচ্ছে বগলুর পোলা গৌরাকে! বগলাপতির আমলে পুরনো ডজ গাড়িটার ছোট আয়নায় গৌরহরি কি বিস্তর নম্বরি নোটের ছবি দেখেনি!

বেশি দিলেই কী! আমি যাব না।

ছেলেটা হঠাৎ অসহায় ভাবটা ঝেড়ে ফেলে হাসল, বেশ আত্মপ্রত্যয়ের হাসি। গৌর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল।

যাবেন না মানে! যাবেন, যাবেন। না গেলে কি চলে?

না গেলে কী করবে?

ছেলেটা, বাচ্চা মিষ্টি চেহারার ছেলেটা হঠাৎ ডান হাত বাড়িয়ে গৌরের ঘাড় ধরে একটা ঝাকুনি দিল, চল শালা, ফের মুখ খুলেছিস কি ভোঁতা করে দেব। ঢোক গলিতে।

গৌরহরি কোনওকালে মারপিট করেনি, মার খায়নি কখনও। বগলাপতি কচিৎ কখনও চড়টা চাপড়টা দিয়েছেন, তার বেশি কিছু নয়। ঘাড়ে ঝাকুনি খেয়ে হঠাৎ গৌরের বড় অপমান লাগল। সে কিনা গৌরহরি, টিকাটুলির বগুলার পোলা গৌরা, তার কিনা ঘাড়ে হাত! গৌর তার ভাল হাতখানা বাড়িয়ে ছেলেটার হাত চেপে ধরল, খুব সাহস যে খোকা! অ্যাঁ! শালা মারব এমন থাপ্পড়!

ছেলেটা অনায়াসে তার হাত ছাড়িয়ে নিল। ধুলো ময়লা ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ট্যাক্সির দুই জানালায় দু' জন ছায়ার মতো উটকো লোক এসে দাঁড়াল। তারা শুধু ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, হুজ্জত করছে নাকি রে?

একটু একটু।

বাইরে থেকে একজন হাত বাড়িয়ে গৌরের কলার চেপে ধরে গোটা দুই ঝাকুনি দিয়ে বলে, জান নিয়ে ফিরতে পারবে না, বুঝলে? গাড়ি জ্বালিয়ে দেব তোমাকে সুদ্ধ।

জ্বালিয়ে দেবে! মানে! জ্বালিয়ে দেবে ল্যান্ডমাস্টারখানা! বগলাপতি অর্থাৎ কিনা বাপ বগলুর দেওয়া একমাত্র নিজস্ব জিনিসখানা তার! এত আদরের গাড়িখানা, যেটা কখনও তার প্রাইভেট কখনও বা পাবলিক! গৌরের আপাদমস্তক চমকে যায়। চেয়ে থাকে।

যাবে কি না?

দরগায় শিন্নি, গির্জেয় মোমবাতি, বদর-বদর, যাব বই কী! রাস্তা দেখাও বাবাসকল। গৌরা যাবে। যদিও বগলুর পোলা গৌরা কারও চাকর না, তবু ল্যান্ডমাস্টারখানা গেলে

গৌরের আর থাকে কী! আঁ। থাকে কী? থাকে শুধু দুটো রুখখা-শুখো হাত পা আর মগজের ঝমঝম শব্দ!

গৌর একটু দম নিয়ে বলে, যাব।

গাড়ি ঘোরান। বাঁ দিকে।

গৌর গাড়ি ঘোরায়।

সেই দুটো লোক তার গাড়ির মধ্যে এসে বসেছে এখন। তাদের একজন তার বাঁ পাশে। তারা খুব চুপচাপ। কথা বলে না একটাও।

আর কতটা পথ?–পৌর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

চালাও। আমরা বলব।

গলিটা অনেক লম্বা। লোকজন বড় একটা দেখা যায় না। বাঁ ধারে একটা জানালা দরজাহীন পাঁচিল চলেছে। ডান হাতে কয়েকটা ছুটকো-ছাটকা বাড়ি। এসব পার হল গৌরহরি। ল্যান্ডমাস্টারখানা শব্দ না করে যাচ্ছে। পুরনো আমলের ইঞ্জিন, তার ওপর যত্নে থাকে গৌরের কাছে।

ক্রমে ডানদিকের বাড়িঘর শেষ হয়ে গেল। একটা মাঠ। তাতে হেডলাইটের আভায় অনেক আগাছা দেখল গৌর। বাঁ দিকে একটা কারখানার মতো। সেটা অন্ধকার, নিপা কথা না বলে গৌর এগোল। আবার বাড়িঘর শুরু হচ্ছে। ছুটকো-ছাটকা। বাঁ দিকের লোকটা হাত বাড়িয়ে গৌরের হাতে চাপ দিল, চাপা গলায় বলল, এইখানে। বাতি নিভিয়ে দাও।

গৌর বাতি নেভাল। লোকগুলো কেউ নামল না। বসে রইল।

বড় ভয় করে গৌরের। বগলুর ছেলে গৌরাকে এ কোথায় নিয়ে এল অচেনা লোকেরা? ব্যাপারখানা কী। তার গাড়ির ডেডবডিটা নাছোড় বটে। কিন্তু কখনও তেমন কোনও বিপদে ফেলেনি তাকে। মাঝে মাঝে নড়ে চড়ে। লেগে থাকে এই পর্যন্ত। তা ছাড়া ডেডবডিটার আর কোনও নিন্দে কেউ করতে পারবে না! এদের চেয়ে সেই ডেডবডিটা অনেক ভাল। তাকে নিয়েই তো এতকাল ল্যান্ডমাস্টারখানা দাবড়ে বেড়াচ্ছে বগলুর ছাওয়াল।

আরও তিনজন লোক অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তার মানে ছ'জন। গৌর বে-আইন দেখেও চুপ করে থাকে। লক্ষ করে যে তিনজন আসছে তাদের মধ্যে মাঝখানের জন নিজের ইচ্ছেয় বা শক্তিতে আসছে না। তাকে আনা হচ্ছে ধরে ধরে। বাঁ দিকের ছোট্ট জমিটুকু পার হয়ে তারা গাড়ির কাছে চলে এল। বাচ্চা ছেলেটা নেমে দাঁড়াল। নিঃশব্দে তিনজন উঠল পিছনের সিটে। আবছা মনে হল গৌরহরির, মাঝখানের লোকটার হাত বাঁধা। মুখে ন্যাকড়ার দলা ভরা আছে। লোকটা অস্পষ্ট একটু শব্দ করল। দু'ধারের দু'জন সিগারেট ধরাল। কথা বলল না। বাচ্চা ছেলেটা আর পিছনের সিটে আগে যারা উঠেছিল তারা নেমে গেল।

গৌরহরির বাঁ পাশের লোকটা বলল, চালাও। সোজা গিয়ে প্রথম ডান হাতে যে রাস্তা পাবে সেইটে ধরো। হেডলাইট জ্বেলল না, জ্যোৎস্না আছে।

তাই সই। গৌর গাড়ি ছাড়ে। কোথায় চলেছে বগলুর বাচ্চা কে জানে! ডান হাতের রাস্তাটা চওড়াই। আলো আছে। লোকজনও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ যেন চেনা কলকাতার কোনও রাস্তাই নয়। এ রাস্তা গৌরহরি তার বাপের, বগলাপতির আমলেও দেখেনি।

কোনদিকে যাব?

চলো সোজা। আমরা বলে দেব।

পিছনের সিটে ডেডবডিটা নেই বটে এখন, কিন্তু যা আছে তা জ্যান্ত বডি। হাত-পা বাঁধা লোকটা একটু পরেই ডেডবডি হয়ে যেতে পারে।

গৌর গাড়ি চালাতে থাকে। যেমন সে চালায় মন-প্রাণ দিয়ে তেমনই চালাচ্ছিল। তার হাত পা মগজ ধীরে ধীরে অধিকার করে নিচ্ছিল ল্যান্ডমাস্টারটার যন্ত্রপাতি।

আস্তে। বাঁ দিকের লোকটা বলে।

গাড়ি ধারে করে গৌর।

লোকটা পিছনের দিকে তাকায়। কী একটা ইঙ্গিত করে।

গৌর দেখে, রাস্তাটা বড় অন্ধকার। কোনওখানে আলো নেই। জ্যোৎস্নাও দেখতে পায় না গৌর। বোধহয় আকাশে মেঘ আছে, কিংবা নোকটা মিথ্যে বলল।

গাড়িটা আস্তে আস্তে যাচ্ছে। বাঁ দিকের লোকটা পিছন ফিরে কী দেখছে। গৌরের ঘাড় ঘোরাতে সাহস হয় না!

হঠাৎ কোঁক করে হেঁচকি তোলার মতো একটা আওয়াজ হয়। মাঝখানের লোকটাই শব্দ করল। অনিচ্ছাতেও উইন্ডস্ক্রিনের ওপর ছোট্ট আয়নাটায় চোখ গেল গৌরহরির। আবছায় তেমন কিছু বোঝা যায় না। তবু মনে হয়, ডানপাশের লোকটা একটা ছোরার হাতল মাঝখানের লোকটার পেট থেকে টেনে বার করল। সঙ্গে সঙ্গে একটু কী যেন ছিটকে এসে লাগল গৌরের বাঁ কানের পিঠে। শুখো হাতটা অবশ হয়ে আসছিল, কোনওক্রমে ঢাল সামলে নিল গৌরহরি।

বাঁ দিকের লোকটা তার হাত ছুঁয়ে বলল, ব্যস, আর না! গাড়ি থামাও।

খুব ম্লান জ্যোৎস্না ফুটেছে। অচেনা রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়েছে গৌরহরি। এ জায়গা সে চেনে না। কোনওকালে আসেনি।

তিনজন লোক তিনটে দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল। একজন জানালায় ঝুকে বলল, একটা বডি রইল। যেখানে হয় ফেলে দিয়ো। পুলিশে যদি যাও, আমরা নম্বর টুকে রেখেছি।

বডি! গৌরহরির চোখ কপালে ওঠে। সত্যিই একটা বডি অবশেষে সামিল ল্যান্ডমাস্টারটায়! বগলুর দেওয়া গাড়িটাতে! ভয় না, ভারী অবাক হয় গৌর।

কী হে, শুনতে পাচ্ছ, যা বললাম?

গৌর মাথা নাড়ে।

যাও। লাইট না জ্বেলে যাও। এগিয়ে গড়িয়াহাটা রোড পাবে।

গৌর মাথা নাড়ে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। গড়িয়াহাটা রোডটা যে আসলে কোথায় তা তার মাথায় ঢোকেই না। সে মাথা নেড়ে গাড়িটা ছাড়ে।

.

তারপর বগলাপতির ছাওয়াল গৌরহরি, অর্থাৎ কিনা বগলুব পোলা গৌরা, তার অদ্ভুত সোয়ারিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। রাস্তাঘাট সে আর চিনতে পারে না। তার মাথার মধ্যে মল-পরা দুটি পা ঝমঝম শব্দ করে। সে শব্দে কেমন তালগোল পাকাতে থাকে রাস্তাগুলি। যেন তাকে ধরেছে কানাওলা। একই রাস্তায় তার গাড়ি ঘুরছে আর ঘুরছে।

কী করেছি আমি! অ্যাঁ! কী করেছি আমি। কী পাপ? কোন অপরাধ? কী করেছে হে বগলুর। ছাওয়াল, যার জন্য তার ল্যান্ডমাস্টারে ডেডবডি? তাকে কেন ধরেছে কানাওয়ালায়? কোন অপরাধ হে বগলুর ছাওয়ালের, যার জন্য তার দুটো হাত-পা শুখখা। আর মগজে ওই বেহদ্দ নাচের শব্দ? এইসব কাকে জিজ্ঞেস করব আমি? কে জবাব দেবে?

পিছনের সিটে ডেডবডিটা নড়ছে আর নড়ছে। একবার পিছন ফিরে তাকায় গৌর। দেখে, বডিটা ধীরে ধীরে কাত হয়ে জানালায় মাথা আটকে থেমে আছে। পেটে একটা হাঁ। রক্ত

জমে গেছে। কে হে বাপু তুমি? কোত্থেকে এলে বগলুর ছাওয়ালের ল্যান্ডমাস্টারে! উড়ে এসে জুড়ে বসলে, কে হে তুমি?

গৌরহরির হাতে গাড়ি এই প্রথম টাল খাচ্ছে। নড়েচড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে হাত সিধে রাখে গৌর। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ল্যান্ডমাস্টারে জীবন কাটে গৌরহরির, অর্থাৎ কিনা বগলুর ছাওয়ালের। তবু আজ তার গাড়ি এ কোন কলকাতা দিয়ে যাচ্ছে। মাইরি, এ সব গাছপালা, রাস্তা, আলো এসব যে গৌরবাবু কখনও দেখেনি! সোয়ারি যেমন বলে তেমনি চলে গৌর, কিন্তু আজকের সোয়ারি যে শালা কথাও বলে না! কেন শালা ভয় দেখাও গৌরবাবুকে! কোন অন্যায় করেছে গৌরা? হ্যাঁ, সত্যি বটে, মাঝে মাঝে সে সোয়ারি কাট মারে। কতবার কত বিপদে পড়া লোককে সে তুলে নেয়নি। মেডিক্যাল কলেজের সামনে এক নতুন পোয়াতি কোলে বাচ্চা নিয়ে রোগা শরীরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছিল, অনেকদিন আগেকার কথা, গৌর তাকে কাট মেরে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর একবার দুটো কচি মেয়ে আর বউ নিয়ে একটা মফসলি হাবা তোক গাড়িতে উঠেছিল। মাঝপথে যখন গৌর বুঝতে পারল এরা হাওড়া স্টেশনে যাবে, হাওড়ায় যাওয়া মানে বিচ্ছিরি জ্যাম আর পুলিশের আওতায় যাওয়া, তখনই সে গাড়ির চাকায় হাওয়া নেই বলে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে লোকদেখানো জ্যাক লাগিয়েছিল গাড়িতে। সেই বোকা লোকটা মাঝপথে কচি মেয়ে আর বউকে নিয়ে কী ভীষণ বিপদে পড়েছিল। এরকম আরও অপরাধ আছে তার। অনেক। কিন্তু কেউ কি গৌরের ল্যান্ডমাস্টারের জন্য ঠেকে ছিল? যে যার গন্তব্যে পৌঁছয়নি কি শেষ পর্যন্ত? পৌঁছেছে, গৌর জানে। তবে আর কী! তবে কেন গৌরের ল্যান্ডমাস্টারে ডেডবডি? বগলুর ছাওয়ালকে কেন ধরেছে কানাওলা?

ডেডবডিটা নড়ে আর নড়ে। রাস্তার টালে গাড়ি লাফায়, আর লটপটে মাথাটা জানালায় ঠুকে যায়। চমকে ওঠে গৌর। কে হে বাপু তুমি? অ্যাঁ! উটকো উঠে বসে আছে! কোথায়? কে হে?

নিঃশব্দ একরকম কথা আছে, সবাই শুনতে পায় না। গৌর শুনল।

ডেডবডিটা নিঃশব্দে বলল, আমি একজন, তুমি চিনবে না হে গৌরবাবু। কোটি কোটি মানুষের ক'জনকে তুমি চেনো? তবে আমি, বুঝলে, আমি এই সংসারের ভাল চেয়েছিলুম। ওইটুকুই আমার পরিচয়। তা দেখো গৌরবাবু, সংসারের ভালমন্দয় হাত দিলেই বিপদ। দিলেই তোমার ভালমন্দেও হাত পড়বে। তবু এই খেলার বড় মায়া। একবার শুরু করলে আর সহজে ছাড়া যায় না। শেষ পর্যন্ত যেতে হয়। আমিও শেষ পর্যন্ত গেছি। এই দেখো না, আমার পেটটা কেমন হা হয়ে আছে। কিন্তু তার জন্য আমার দুঃখ নেই গো, বেশ আরামই লাগছে। সব ভালমন্দ শেষ করেছি আমি। তোমার ল্যান্ডমাস্টারের চমৎকার গদিতে শুয়েছি আরামে, আর উঠব না হে। দিব্যি লাগছে। বলতে কী গৌরবাবু, গাড়ি চালানোর হাত তোমার ভালই। দুলুনি লাগছে, ঘুম আসছে, বাইরে জ্যোৎস্না, মোলায়েম বাতাস বইছে, এর মধ্যে অনন্ত ঘুম ছাড়া বেশি সুখ আর কীসে! চালাও গৌরবাবু, চালাও, থেমো না। আমরা দুজনে চলল, এই ল্যান্ডমাস্টারে সংসার ছেড়ে যাই, চলো হে বগলুর পোলা!

তা গৌর তার উইন্ডস্ক্রিন জুড়ে সত্যিই সংসারের বাইরের দৃশ্য দেখতে পায়। ঢাকার সেই কামান অবিরাম লাল নীল হলুদ গোলা ছুঁড়ছে। সেই গোলাগুলো ভাসতে ভাসতে চলেছে ফাদার ফ্রান্সিসের পিছু পিছু। ফাদার হেসে কুটিপাটি, ডেকে বলছে, হেই গৌরঅরি, ফ্যাস, ফ্যাস দি বল!

গাছের পাতায় পাতায় ডালে কুয়াশায় সাদা ফুল দোলে, দোলে চাঁদের মতো উজ্জ্বল ফল। রাস্তা হঠাৎ এঁকে-বেঁকে আকাশমুখো উঠতে থাকে। গৌরহরির ল্যান্ডমাস্টার রাস্তার তোয়াক্কা না করে হঠাৎ শুন্যে উঠে উড়তে থাকে। ভেসে ভেসে চলে।

অনন্ত যাত্রায় একটা ডেডবডি সহ গৌরের ল্যান্ডমাস্টার চলে যায়। যেতে থাকে। তার মিটারের টাকা-পয়সার অঙ্ক মুছে যায়। সেখানে পর পর ফুটে উঠতে থাকে, ভালবাসা..পরিপূর্ণতা...ঈশ্বর...